ম্যানগ্রোভস বনভূমি ও বর্তমান সংকট

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণদিকে জোয়ার-ভাটা প্লাবিত অঞ্চলে শ্বাসমূলযুক্ত যে বিশেষ উদ্ভিদ সমষ্টি চোখে পড়ে তারা মিলেমিশে ম্যানগ্রোভস অরণ্য বা বাদাবন তৈরি করেছে।

এই বনের উদ্ভিদেরা বেঁচে থাকার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। এই বনের বাইন, পশুর, কেওড়া, গরান প্রভৃতি উদ্ভিদের নীচের অংশ জোয়ারের সময় দিনে দু-বার জলে ঢেকে যায়। মাটির সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো কাদায় ঢাকা পড়ায় শ্বাসকার্য চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এইসব উদ্ভিদের মূল থেকে মাটির ওপরে মুলোর মতো অসংখ্য শ্বাসমূল বেরোয়।

আবার কোনো ম্যানগ্রোভ যাতে জোয়ার-ভাটার স্রোতের টানে উপড়ে না যায় তার জন্য ঠেসমূল বের করে। গর্জন গাছে এটি ভালোভাবে চোখে পড়ে। আবার গর্জন, গরান, কাঁকড়া প্রভৃতি উদ্ভিদে বংশরক্ষার তাগিদে পাকা ফল মাটিতে পড়ার আগেই তার মধ্যে অঙ্কুরোদ্‌গম হয়ে যায়। শিশু উদ্ভিদটি যাতে মাটিতে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারে তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভস অরণ্যের উদ্ভিদরা অনবরত আরেকটি সমস্যার মুখোমুখি হয়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের নোনাজল

সরাসরি খাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। এক হাজার গ্রাম সমুদ্রের জলে প্রায় 33-38 গ্রাম লবণ থাকে যা স্থলভাগের উদ্ভিদরা সহ্য করতে পারে না। কারণ অতিরিক্ত লবণ উদ্ভিদের দেহকলায় বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। বাদাবনের উদ্ভিদেরা আংশিকভাবে মূল বা পাতার লবণ গ্রন্থির সাহায্যে এই লবণ বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়াও পাতা ঝরে যাওয়ার মাধ্যমেও লবণ বার করে দেয়।

তবে বর্তমানে পরিবেশের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকায় জলের উচ্চতা ক্রমাগত বাড়ছে। আর জলে বাড়ছে নুনের পরিমাণ। এতে বহু গাছের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করেছে। ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে বাঘ, খাঁড়ির কুমীর, রিভার টেরাপিন(নদীর কচ্ছপ) -এর মতো প্রাণীরা।

তোমার বাড়ির আশেপাশে বন থাকলে বা যদি কোনোদিন কোনো বনে যাও তবে বনের নিম্নলিখিত বিষয়ে খেয়াল করো বা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করো এবং তোমার ডায়েরিতে তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করো।

1. বনে কী কী ধরনের গাছ দেখা যায়? 2. বনের জলের উৎস কী কী? 3. বনাঞ্চলে কী কী প্রাণী বেশি করে চোখে পড়ে? 4. বনে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী তুমি দেখতে পেলে তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করো। 5. ওই বনের ওপর আশেপাশের মানুষ কীভাবে নির্ভরশীল? 6. বনের গাছের পরাগমিলনে সাহায্যকারী কোন কোন প্রাণী তোমার চোখে পড়েছে? 7. বনের যেসব তৃণভোজী ও মাংসাশী যেসকল প্রাণী তোমার চোখে পড়েছে বা যাদের কথা তুমি জেনেছ তাদের নাম লেখো। 8. বনের কী কোনো সমস্যা তোমার চোখে পড়েছে? 9. কী করে ওই সমস্যার সমাধান করা যায়?

সমুদ্রের নীচের জীবন

সমুদ্র তোমরা অনেকেই দেখেছ। আর সমুদ্রের ধার থেকে ঝিনুকও নিশ্চয়ই কুড়িয়েছো। ওই ঝিনুকগুলো আসলে একধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক। শক্ত খোলকটা প্রাণীটার নরম দেহকে রক্ষা করত। আমাদের চারপাশে যেমন নানাধরনের জীবেরা বাস করে, সমুদ্রেও তেমনি বাস করে অনেক ধরনের উদ্ভিদ আর প্রাণী।

এসো এবারে সমুদ্র আর সমুদ্রের জীবদের চেনা আর জানার চেষ্টা করি। সমুদ্র আর সমুদ্রের জীবদের সম্বন্ধে জানার প্রথম ধাপটাই হলো সমুদ্রকে চেনা।

মনে করো, তোমাকে কোনো একটা যানে (যার জানালাগুলো কাঁচের মতো স্বচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরি) করে আস্তে আস্তে সমুদ্রের গভীরে নামিয়ে দেওয়া হতে লাগল। সমুদ্রের যত গভীরে নামবে জলের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের চাপও বেড়ে যাবে। তাই যান আর যানের জানালাগুলো এমন জিনিস দিয়ে তৈরি যা জলের এই প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে। দিনের বেলায় যদি নামো, দেখবে সমুদ্রের জলতলের ঠিক নীচের অংশে কত আলো! কত বিচিত্র প্রাণী সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্যাওলা জাতীয় নানারকমের উদ্ভিদও তোমার চোখে পড়বে। সমুদ্রের গভীরে যত নামবে দেখবে সূর্যের আলো ক্রমশ কমে আসছে। আর তোমার চারপাশ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। প্রাণীদের সংখ্যাও ক্রমশ কমছে। আরও নীচে গেলে দেখতে পাবে নিকষ কালো অন্ধকার। কেবল তোমার যানের তীব্র আলোয় চারপাশের অন্ধকার অল্প অল্প করে কেটে যাচ্ছে। সেই আলোয় কখনো কখনো চোখে পড়ছে বিচিত্রদর্শন সব প্রাণী। সমুদ্রের গভীরে যেসব জীবেরা বাস করে তারা এই প্রচণ্ড চাপ আর অন্ধকারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। সমুদ্রের সব অঞ্চলে জীবের দেখা পাওয়া যায় না। আবার সমুদ্রের এমন কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেখানে অধিকাংশ জীবের বাস।

অ্যাঙ্গলার মাছ

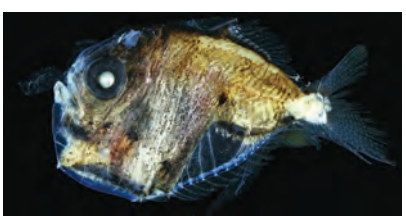

হ্যাচেট মাছ

যেসব সমুদ্রে প্রবাল প্রাচীর থাকে সেখানে মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের বৈচিত্র্য খুব বেশি।

সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনের বৈচিত্র্য

জোয়ারের সময় জল যতদূর পর্যন্ত বেড়ে যায় আর ভাটার সময় যতদূর অবধি জল নেমে যায়– তার মাঝের যে অঞ্চল, সেখানে দেখা মেলে নানা জীবের। যেমন লাইকেন, শ্যাওলা, শামুক, ঝিনুক, তারা মাছ, সাগরকুসুম, কাঁকড়া ইত্যাদি। মহীসোপানের (সমুদ্রে ডুবে থাকা মহাদেশের অংশ) ওপরে জলময় যে অঞ্চল, সেখানেও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক জীবের দেখা পাওয়া যায়। এখানে জলের তলায় কেল্পের অরণ্য আর সামুদ্রিক ঘাসের তৃণভূমিতে দেখা পাওয়া যায় স্পঞ্জ আর অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী, ছোটো মাছ, সামুদ্রিক কচ্ছপ, সী-কাউ, সী হর্স আর ছোটো ছোটো সামুদ্রিক চিংড়ির। কেল্প হলো আসলে একধরনের সামুদ্রিক শ্যাওলা। খালি চোখে দেখা যায় না এমন আণুবীক্ষণিক জীবেরাও বাস করে এই অঞ্চলে।

এরপর খোলা সমুদ্রের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সেখানে জলের বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন রকমের মেরুদণ্ডী (হাঙর, হ্যাচেট মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ, তিমি) আর অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের (জেলি ফিস, সাগরকুসুম, চিংড়ি,

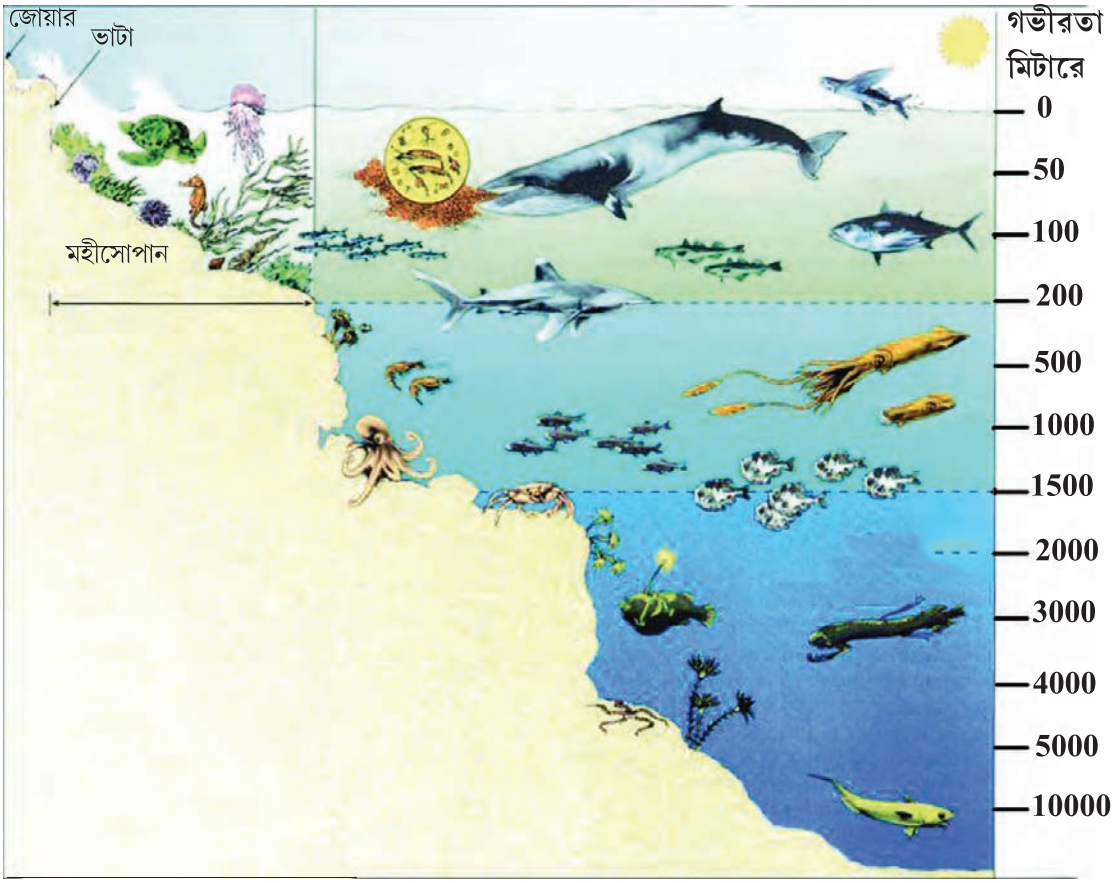

কাঁকড়া, স্কুইড, অক্টোপাস, তারামাছ, সমুদ্র শশা) দেখা মেলে। সমুদ্রের যে গভীরতা অবধি সূর্যের আলো প্রবেশ করে সেখানে নানাধরনের উদ্ভিদের দেখা পাওয়া যায়। জলতলের ঠিক নীচে যতদূর অবধি সূর্যের আলো আর তাপ প্রবেশ করতে পারে, সেখানেই জীবনের বৈচিত্র্য বেশি। কারণ এই অঞ্চলে থাকা সবুজ উদ্ভিদেরা সূর্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করতে পারে। সবুজ উদ্ভিদের সূর্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করার এই প্রক্রিয়াটাই হলো সালোকসংশ্লেষ। এই খাবারের ওপর নির্ভর করে এই অঞ্চলের অন্য সব জীবেরা। আর সমুদ্রের গভীরে বসবাসকারী জীবেরা খাবারের জন্য নির্ভর করে সূর্যের আলোয় আলোকিত ওপরের অঞ্চল থেকে ভেসে নেমে আসা খাবারের টুকরো বা উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষের ওপর। অনেকসময় এরা অন্য জীবদের শিকার করেও খাবার জোগাড় করে। সমুদ্রের যত গভীরে যাওয়া যায় সূর্যের আলো ততই কম প্রবেশ করে। আর তাই সমুদ্রের গভীরে জলের তাপমাত্রাও কমতে থাকে। গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী জীবদের তাই কম তাপমাত্রা আর প্রচণ্ড চাপের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে হয়।

ওপরের ছবিতে তোমরা বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন জীবদের দেখতে পাচ্ছ। বিভিন্ন জীবদের যে গভীরতায় দেখতে পাচ্ছ তাদের সবসময় যে ওই গভীরতাতেই দেখা যাবে তার কিন্তু কোনো ঠিক নেই। কারণ ওদের মধ্যে অনেকেই কখনও খাবারের খোঁজে আবার কখনও বা অন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে জলের বিভিন্ন গভীরতায় ওঠানামা করে।

বায়োলুমিনিসেন্স (Bioluminescence)

সমুদ্রের গভীরে সূর্যের আলো প্রবেশ না করলেও অন্য এক ধরনের আলোর দেখা পাওয়া যায়, যার কোনো উত্তাপ নেই। একে বলে বায়োলুমিনিসেন্স (Bioluminescence)। সমুদ্রের গভীরে কিছু জীবের দেখা মেলে যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের দেহে আলো তৈরি করতে পারে। এরা হলো বায়োলুমিনিসেন্ট (Bioluminescent) জীব।

বায়োলুমিনিসেন্স কথাটার উৎপত্তি কোথা থেকে সেটা আগে দেখা যাক। গ্রিক শব্দ Bios = জীবিত (living) আর ল্যাটিন শব্দ lumen = আলো (light)। অর্থাৎ জীবের থেকে আসা আলো। বায়োলুমিনিসেন্ট জীবদের দেহে একধরনের প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত রঞ্জক পদার্থ থাকে — লুসিফেরিন (Luciferin)। আর থাকে একধরনের উৎসেচক — লুসিফারেজ (Luciferase)। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এই দুইয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তি পরিবর্তিত হয় আলোকশক্তিতে। তৈরি হয় 'ঠান্ডা আলো' বা বায়োলুমিনিসেন্স। অবশ্য সব বায়োলুমিনিসেন্ট প্রাণীদের দেহেই যে এই দুটো পদার্থ থাকে এমন নয়। কোনো কোনো প্রাণীরা এই আলো তৈরির অন্য কিছু আলো-উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায় অর্থাৎ তাদের সঙ্গে মিথোজীবী সম্পর্ক গড়ে তোলে। বেশিরভাগ বায়োলুমিনিসেন্ট জীবদের দেখা মেলে সমুদ্রের 200-1000 মিটার গভীরতায়। বায়োলুমিনিসেন্স এই জীবদের নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন - খাবার খোঁজা, খাদ্যকে আকর্ষণ করা, ছদ্মবেশ ধারণ, আত্মরক্ষা ইত্যাদি।

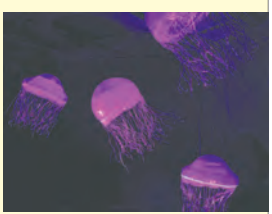

সমুদ্রের জীব

প্ল্যাংকটন: (গ্রিক শব্দ Planktos = ভেসে বেড়ায়)

এরা একধরনের জলজ জীব, যারা স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে পারে না। এরা বড়ো বড়ো জলজ প্রাণীদের (মাছ, তিমি) খুব গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। এরা প্রধানত দু-ধরনের ।

i) ফাইটোপ্ল্যাংকটন (গ্রিক শব্দ Phytos = উদ্ভিদ): এরা সূর্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করতে পারে।

ii) জুপ্ল্যাংকটন (গ্রিক শব্দ Zoon = প্রাণী): এরা নিজেরা খাবার তৈরি করতে পারে না; অন্য প্ল্যাংকটনদের খায়।

উদ্ভিদ

1. ফাইটোপ্ল্যাংকটন

ডায়াটম

এই এককোশী আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদেরা সাধারণত জলের ওপরের দিকটায় বাস করে। সূর্যের আলোর সাহায্যে এরা খাবার তৈরি করে। বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের খাদ্য এরা। তাছাড়াও পরিবেশে কার্বনের ভারসাম্য বজায় রাখায় এদের ভূমিকা আছে।

a) **ডায়াটম :** এরা এককোশী। এরা এককভাবে বা শৃঙ্খলাকারে কলোনি তৈরি করে। এদের কোশপ্রাচীর সিলিকা দিয়ে তৈরি।

b) **ডিনোফ্ল্যাজেলেট :** এরা এককোশী। ডায়াটমদের মতো এদের সিলিকা দিয়ে তৈরি কোশপ্রাচীর থাকে না। এরা এককভাবে থাকে, কলোনি তৈরি করে না। ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে এরা চলাফেরা করে।

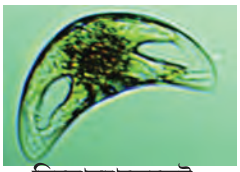
ডিনোফ্ল্যাজেলেট

কেল্প

2. কেল্প (Kelp)

এরা খুব বড়ো সামুদ্রিক শ্যাওলা। সমুদ্রের অগভীর অংশে এরা জন্মায়। এমনভাবে এরা বাড়ে যে সমুদ্রের নীচে প্রায় একটা অরণ্য তৈরি করে ফেলে। বেশিরভাগ প্রজাতির দেহ চ্যাপটা, অনেকটা পাতার মতো দেখতে। মূলের মতো একটা অংশের সাহায্যে এরা জলের নীচে কোনো কিছুর সঙ্গে আটকে থাকে। এরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।।

প্রাণী

1. জুপ্ল্যাংকটন (Zooplankton)

ক্রিল

এরা মূলত আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী। অবশ্য সবাই আণুবীক্ষণিক নয়। এরা সমুদ্রের ওপরের তলে ভেসে বেড়ায়। ফাইটোপ্ল্যাংকটনের মতোই এরা ভালো সাঁতার কাটতে পারে না, তাই ভেসে বেড়ায়। অবশ্য কেউ কেউ ভালো সাঁতার কাটতে পারে। কিন্তু শত্রুর চোখ এড়াতে বা সহজে খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভেসে বেড়ায়।

2. সাগরকুসুম (Sea anemone)

সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে অনেকসময় চোখে পড়ে বহু পাপড়িযুক্ত ফুলের মতো একটা জিনিস। হাতে করে তুললে দেখা যায় একটা নরম আর লম্বা বৃন্তের ওপরে ফুলের পাপড়িগুলো যেন ছড়িয়ে আছে। ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে পাপড়িগুলো সামনে আর পেছনে আন্দোলিত হচ্ছে। এটাই সাগরকুসুম। এই সামুদ্রিক প্রাণীটার দেহটা ফাঁপা। পাপড়ির মতো উপাঙ্গগুলোর ঠিক মাঝখানে হলো তার মুখ। এই পাপড়িগুলো আসলে কর্ষিকা। এই কর্ষিকাগুলোতে থাকে অসংখ্য দংশক কোশ। ছোট মাছ বা অন্য কোনো প্রাণী শিকার করতে কাজে লাগে।

সাগরকুসুম

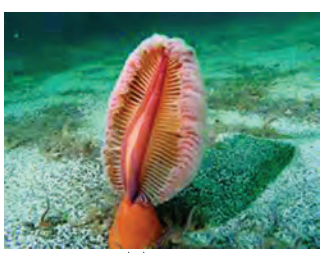
সাগরকলম

3. সাগরকলম (Sea-pen)

এই প্রাণীটির শরীরের দুই দিকেই সরু অংশ থাকে। অনেকটা হাঁসের পালকের তৈরি কলমের মতো। সী পেনের সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য শাখা। প্রতিটা শাখাই মূল দেহ থেকে বেরিয়েছে। সী পেনকে পাথরে আটকে রাখতে সাহায্য করে এই শাখাগুলো।

4. অক্টোপাস (Octopus)

এদের বাহুর সংখ্যা আট। তাই নাম অক্টোপাস। শরীর গোলাকার। এদের দেহের বাইরে কোনো খোলক নেই। এদের বাহুগুলো লম্বা লম্বা শুঁড়ের মতো — ওপরের দিকটা মোটা আর নীচের দিকে ক্রমশ সরু। বাহুগুলোতে অনেকগুলো করে শোষক যন্ত্র থাকে। এই বাহুগুলোর কেন্দ্রে থাকে মুখ। অক্টোপাসের দুটো বড়ো বড়ো চোখ

অক্টোপাস

থাকে। অক্টোপাসের মস্তিষ্ক আর চোখ অমেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে উন্নত বলে মনে করা হয়। অধিকাংশ অক্টোপাসই খুব ছোটো আকারের হয়। সবচেয়ে বড়ো অক্টোপাস হলো প্রশান্ত মহাসাগরের দৈত্যাকার অক্টোপাস। সব অক্টোপাসেরই বিষ আছে। তবে সাধারণত এই বিষ ক্রিয়া করে কাঁকড়া, চিংড়ি, এইসব প্রাণীদের ওপর। কেবল ব্লু-রিংড অক্টোপাস (blue-ringed octopus) মানুষের পক্ষে প্রাণঘাতী হতে পারে। দেখতে যতই বীভৎস হোক না কেন, অক্টোপাসেরা কিন্তু নিরীহ আর ভীরু। আক্রান্ত হলে এরা এদের দেহের একটি গ্রন্থি থেকে কালি ছিটিয়ে জল ঘোলা করে দিয়ে পালিয়ে যায়।

মা অক্টোপাস আঙুরের মতো আকারের ছোটো গোল গোল ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত মা অক্টোপাস পাহারা দেয়। এমনকি খেতেও যায় না যাতে কাঁকড়া বা অন্য প্রাণীরা ডিমের কোনো ক্ষতি না করে। মা অক্টোপাস তিলে তিলে অনাহারে মৃত্যুবরণ করার আগের মুহূর্ত অবধি সন্তানের যত্ন নেয়। তারপর ডিম ফুটে ছড়িয়ে যায় শিশু অক্টোপাসেরা। আর ধীরে ধীরে মা অক্টোপাসের মৃতদেহ নেতিয়ে পড়ে জলের তলায়।

5. স্কুইড আর কাটল ফিশ

স্কুইড

স্কুইডের বাহু দশটা। মাথার কাছে থাকে আটটি ছোটো আর দুটো বড়ো লম্বা মাংসল প্রত্যঙ্গ। এই হলো মোট দশটা বাহু। প্রতিটি বাহুতে থাকে একাধিক শোষক যন্ত্র। এদের দেহ লম্বাটে, টর্পেডোর মতো। আর লেজের দিকে রয়েছে পাখনা। শোষক যন্ত্রের সাহায্যে স্কুইড শিকার ধরে। আক্রান্ত হলে বাদামি কালির মতো তরল জিনিস ছিটিয়ে জলের রং ঘোলাটে করে শত্রুকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে যায়।

কাটল ফিশ

দৈত্যাকার স্কুইড বাস করে আটলান্টিক সমুদ্রের গভীরে। এরা সাধারণত 50-60 ফুট লম্বা হয়। এদের বাহুর দৈর্ঘ্যই 30 ফুট। দেহের মধ্যে আছে অনেকটা বর্শার ফলার মতো দেখতে ক্যালশিয়ামঘটিত একটা শক্ত জিনিস। স্কুইডের আত্মীয় কাটল ফিশ সমুদ্রের ধারে পচে গেলে এই ক্যালশিয়ামঘটিত শক্ত জিনিসটা সহজেই সংগ্রহ করা যায়। এই জিনিস সমুদ্র ফেনা নামে বিক্রি হয়।

6. হাঙর (Shark)

হাঙর শক্ত হাড়ের মাছ নয়। এদের কঙ্কাল তৈরি হয় হাড়ের চেয়ে নরম কার্টিলেজ দিয়ে। এই ধরনের পদার্থ দিয়েই আমাদের নাকের ডগা বা বহিঃকর্ণের শক্ত অংশ তৈরি হয়েছে। খুব অল্প জাতের হাঙরই মানুষখেকো - যেমন গ্রেট হোয়াইট শার্ক, লম্বায় প্রায় 6 মিটারের মতো। হাঙরদের একটা দাঁত ভেঙে গেলে পেছনের সারির সেই অংশের দাঁত সামনে এগিয়ে এসে হারানো দাঁতের জায়গা দখল করে নেয়।

হোয়েল শার্ক

এদের কানকোর চেহারা কাটা দাগ বা ফাটলের মতো (slit)। এরকম পাঁচটা ফাটল বা স্লিট থাকে। হাঙরের

চামড়ায় ছোটো ছোটো আঁশ থাকে। এগুলো পেছনের দিকে ঢালু। তাই হাঙরের মুখ থেকে লেজের দিকে হাত বোলালে নরম লাগে। কিন্তু লেজের দিক থেকে মুখের দিকে হাত বোলালে শিরীষ কাগজের মতো অমসৃণ বা খসখসে মনে হয়। একসময় কাঠ পালিশ করার কাজে হাঙরের চামড়া বা শ্যাগ্রীন ব্যবহার করা হতো।

হ্যামার হেডেড শার্ক

বাস্কিং শার্ক আর হোয়েল শার্কের মতো বড়ো আকারের হাঙর মানুষের ক্ষতি করে না। এদের গলা এত ছোটো যে এরা শুধু খুব ছোটো মাছ আর প্ল্যাংকটন খেয়েই বেঁচে থাকে। হোয়েল শার্ক মুখ খুলে সাঁতার কাটে। আর জলের সঙ্গে ভেসে আসা ছোটো ছোটো জলচর প্রাণীদের খেয়ে ফেলে। এদের কানকো ছাঁকনির কাজ করে। কানকো দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। আটকা পড়ে যায় প্রাণীরা। হোয়েল শার্ক তখন এদের খায়। অধিকাংশ হাঙর বাচ্চা প্রসব করে। তবে কোনো কোনো জাতের হাঙর আবার ডিমও পাড়ে। হ্যামার হেডেড শার্ক দেখতে খুব ভয়ংকর। এর মাথাটা একটা বিরাট হাতুড়ির মতো, যার দু-প্রান্তে দুটো চোখ থাকে। এই হাঙরও মানুষখেকো হতে পারে।

7. তারামাছ

তারামাছের বাহুর সংখ্যা সাধারণত পাঁচটি। বাহুগুলো চ্যাপটা মোটা পাতের মতো দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কখনো কখনো এদের চারটে বা দুটো বাহুও দেখা যায়। একটা বাহু ভেঙে গেলে সেখানে আবার নতুন বাহু তৈরি হয়ে যায়। তারামাছের বাহুর ভেতরের দিকে নরম আঙুলের মতো উপাঙ্গ আছে, যার নাম টিউব ফিট বা নালিপদ। এই নালিপদগুলো ফাঁপা আর এদের শেষপ্রান্তে আছে চোষক বা সাকার। নালিপদগুলোর সাহায্যে জল টেনে নিয়ে আর বের করে দিয়ে তারামাছ শিকার ধরে। জল টানায় সাময়িক শূন্যতা (vacuum) তৈরি হয়, ফলে শিকার নালিপদে আটকে যায়। এই নালিপদের সাহায্যেই তারামাছ চলাফেরা করে।

তারামাছ

ঝিনুক এদের প্রিয় খাবার। কোনো ঝিনুকের সন্ধান পেলে নালিপদের সাহায্যে এরা ঝিনুকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। ফলে ক্রমাগত টান পড়ার ফলে ঝিনুকটা বাধ্য হয় খোলের ভেতরে থেকে বেরিয়ে আসতে।

এসো এবারে আরও কয়েকটা সামুদ্রিক উদ্ভিদ আর প্রাণীদের চিনে নিই।

সামুদ্রিক ঘাস

মাকড়সা কাঁকড়া

লবস্টার

ব্লু-রিংড অক্টোপাস

ললিগো

সোর্ডফিশ

গ্রিন সী টার্টল

স্পার্ম তিমি

সমুদ্রে দূষণ ও সমুদ্রের জীবের সমস্যা

সমুদ্রে দূষণের মূলে কী কী আছে, তাদের একবার চিনে নিই। এরা হলো কীটনাশক, আগাছানাশক, রাসায়নিক সার, ডিটারজেন্ট, তেল, জৈব বর্জ্যযুক্ত ময়লা জল বা সিউয়েজ, প্লাস্টিক আর নানা কঠিন বস্তু।

1. রাসায়নিক সার ও জৈব বর্জ্য যুক্ত ময়লা জল

রাসায়নিক সার আর জৈব বর্জ্যযুক্ত ময়লা জলে থাকা নানা পুষ্টি উপাদান সমুদ্রের জলে মেশার ফলে ফাইটোপ্ল্যাংকটনরা সংখ্যায় খুব বেড়ে যায়। সমুদ্রের জল ঢেকে দেয় এরা। একে বলা হয় অ্যালগাল ব্লুম (Algal bloom)। ডিনোফ্ল্যাজেলেটেরা সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে জলের রঙ লাল হয়ে যায়। এটাও একধরনের অ্যালগাল ব্লুম। এদের দেহ থেকে বেরোনো অধিবিষ (Toxin) অন্যান্য সামুদ্রিক জীবদের মৃত্যুও ঘটাতে পারে। জলের স্বচ্ছতা কমে গিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে সালোকসংশ্লেষ বাধা পায়। আর এই বিপুল পরিমাণ শৈবালরা শ্বাসকার্য চালানোর ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে গিয়ে সামুদ্রিক প্রাণীদের অক্সিজেনের অভাব ঘটে। যার ফলে ওইসব প্রাণীদের মৃত্যু ঘটতে পারে।

2. তেল

তেল বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এমন জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটলে বা ডুবে গেলে বা সমুদ্রে তেল তোলার জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটলে সমুদ্রে তেল মেশে। সামুদ্রিক জীবদের পক্ষে এই তেল বিষের মতোই। কারণ অপরিশোধিত তেলে থাকে নানা বিষাক্ত পদার্থ। সমুদ্রের জলের ওপরে তেলের স্তর থাকলে জলে অক্সিজেন ঢুকতে বাধা পায়। ফলে জলের জীবেরা অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে পারে। এছাড়াও সামুদ্রিক প্রাণীদের চামড়ায় ঘা আর চোখ, মুখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গে অস্বস্তি বা প্রদাহ হতে পারে। সমুদ্রের জলে তেল মিশলে সামুদ্রিক প্রাণীদের তাপ-নিরোধক আর জল-নিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এসে তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এছাড়াও তেলে ভিজে যাওয়া পাখিরা ঠোঁট দিয়ে নিজেদের তেলে ভেজা পালকে বোলালে, ওই তেল তাদের শরীরে ঢুকে অভ্যন্তরীণ অঙ্গেরও ক্ষতি করতে পারে।

3. প্লাস্টিক

সমুদ্রে প্লাস্টিকজাত জিনিস ফেলা হলে সেগুলো ভাসতে থাকে। অনেকসময় সামুদ্রিক প্রাণীরা খাবার ভেবে এইসব প্লাস্টিকজাত জিনিস খেয়ে ফেলে। প্লাস্টিক বর্জ্য বড়ো আকারের হলে খাদ্যনালীতে আটকে গিয়ে খাবার যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। অনাহার বা সংক্রমণে প্রাণীটার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

4. সমুদ্রের জলের অম্লতা বেড়ে যাওয়া

মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে পরিবেশে CO_2 নির্গমন বাড়ছে। সমুদ্র এই CO_2-এর একটা বিরাট অংশ শোষণ করে। ফলে পরিবেশে CO_2-র পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলের অম্লত্ব বাড়ছে। আর এর প্রভাব পড়ছে মাছ, স্কুইড আর অন্যান্য ফুলকাযুক্ত সামুদ্রিক প্রাণীদের ওপর। কারণ আম্লিক সমুদ্রের জল থেকে শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেন পাওয়া এদের পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তাছাড়াও জলের অম্লতা বেড়ে গেলে কাঁকড়া, লবস্টার আর কোরালদেরও ক্যালশিয়াম কার্বনেটের খোলক তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়বে। অতিমাত্রায় আম্লিক সমুদ্রের জলে এইসব প্রাণীদের ক্যালশিয়াম কার্বনেটের খোলক নষ্টও হয়ে যেতে পারে।

মরুঅঞ্চলের জীবজগৎ

ছবিটি দেখে মরুভূমি অঞ্চলের বৈচিত্র্যগুলো সম্পর্কে তোমার ধারণা লেখো —

মরুভূমি			
ভূ-প্রকৃতি	জলবায়ু	গাছপালা	জীবজন্তু

মরুভূমিতে শুধু বালি আর বালি। পৃথিবীর প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে মরুভূমি। যতদূরে চোখ যাবে শুধু বালি। তাই বলে তার সীমানা নেই তা কিন্তু নয়। আমাদের দেশের থর মরুভূমির দিকে তাকাও। সাতলেজ নদীর পাড় থেকে পূর্বদিকে আরাবল্লী পর্বতকে ঘিরে রয়েছে থর। দক্ষিণে কচ্ছের রণ, পশ্চিমে সিন্ধু নদ। রাজস্থানের সীমানা জুড়ে রয়েছে মরুভূমি।

কোথাও জল নেই। বৃষ্টির ভীষণ অভাব। দিনের বেলায় রোদের তাপ খুব বেশি। বছরে 20 সেন্টিমিটারেরও কম বৃষ্টি হয়। শুধু বালি আর বালি থাকায় জল মাটিতে শোষিত হয় না। ফলে সূর্যের আলো প্রায় 90 শতাংশ বিকিরিত হয়। রাতের বেলা খুব ঠান্ডা। কিছু মরুভূমিতে আবার ভীষণ ঠান্ডা, যেমন এশিয়া মহাদেশের গোবি, কিংবা আন্টার্কটিকা মহাদেশের মরুভূমি। আশঙ্কার কথা হলো মরুভূমির আয়তন ক্রমশ বাড়ছে।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটা করো—

1। মেরুপ্রদেশের মরুভূমিগুলো ঠান্ডা হওয়ার কারণ কী ?

পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে গেছে নিরক্ষরেখা। উত্তরে রয়েছে কর্কটক্রান্তি আর দক্ষিণে মকরক্রান্তি। মজার বিষয় হলো, নিরক্ষরেখা বরাবর কোনো মরুভূমি নেই। কিন্তু কর্কটক্রান্তি আর মকরক্রান্তি রেখা বরাবর মরুভূমি রয়েছে। এর কারণগুলো শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে লেখার চেষ্টা করো।

মরুভূমির বালির ভেতর লুকিয়ে রয়েছে অপার বিস্ময়। যেখানে বৃষ্টি নেই, জল নেই, আছে শুধু ভয়াবহ উত্তাপ কিংবা ঠান্ডা, এরকম কষ্টকর পরিবেশেও ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে জীবজগতের অপার ভাণ্ডার। আমরা গরমে একটু কষ্ট পেলেই পাখা চালাই, কিংবা ঠান্ডায় কাঁথা বা লেপ চাপা দিই। কিন্তু শত কষ্ট সত্ত্বেও মরুভূমির জীবজগৎ মরুভূমি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায় না। নানা মরুভূমিতে নানারকম জীবের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

নানাদেশের মরুভূমির জীবজগৎ

নীচের ছবিগুলো দেখো। তোমাদের ধারণা থেকে মরুভূমির জীবগুলোতে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

পৃথিবীর প্রধান প্রধান মরুভূমি

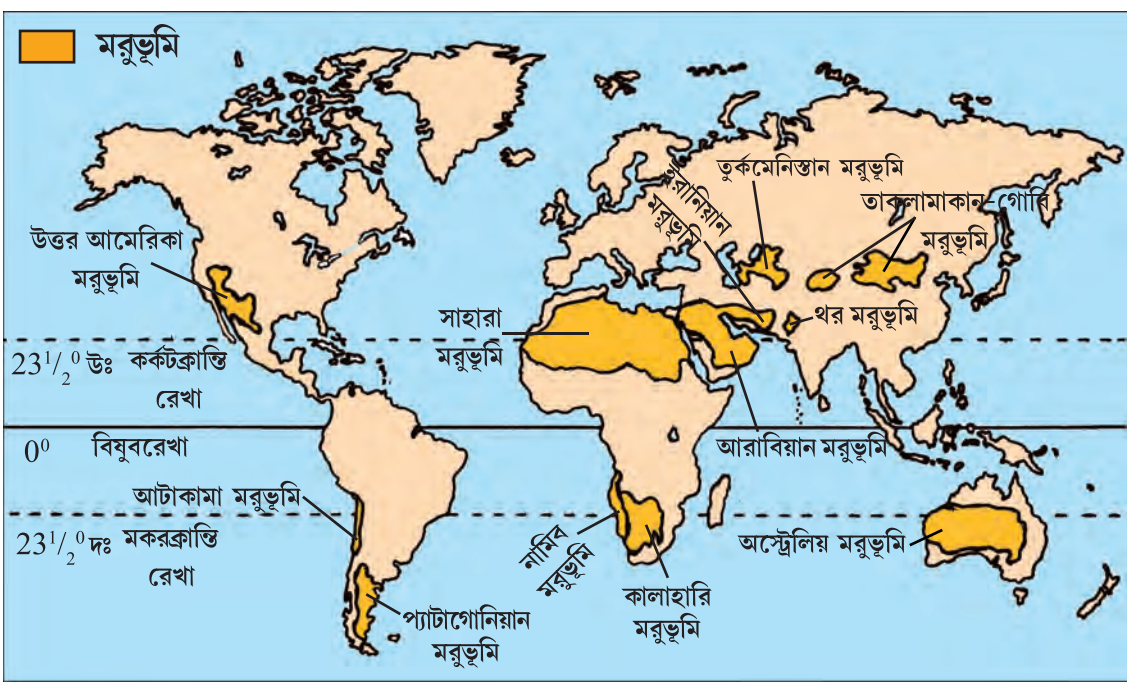

গরম/ঠান্ডা মরুভূমি	মরুভূমির নাম	কোন মহাদেশে অবস্থিত	প্রাণী
গরম	আরবের মরুভূমি	এশিয়া	উট, শেয়াল, খরগোশ, শজারু, বালি কেউটে, ক্যামেলিয়ন, কাঁকড়াবিছে, শকুন
ঠান্ডা	গোবি	এশিয়া	ব্যাক্ট্রিয়ান উট, বিটল, নীলপাহাড়ি পায়রা, ভালুক, বরফ চিতা, বন্য ভেড়া
গরম	থর	এশিয়া	কাঁটাওলা লেজবিশিষ্ট গিরগিটি, শেয়াল, উট, সাপ, শকুন
গরম	সাহারা	আফ্রিকা	পেঁচা, হরিণ, শজারু, শেয়াল, উটপাখি, হায়না

মরূদ্যান

যেখানে শুধু বালি আর বালি বৃষ্টির নামগন্ধও নেই, সেখানে মরূদ্যান! মানে গাছপালা, জলাশয়, নানা ধরনের প্রাণী। এও সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব, চারিদিকে বালির সমুদ্র মনে হলেও বালির নীচে অনেক গভীরে যে শিলাস্তর রয়েছে সেখানে রয়েছে জল। মরুভূমিতে যে সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তার বেশিরভাগ অংশই বালির নীচে গভীরে সেই শিলাস্তরে জমা হয়। মরুভূমির কোথাও কোথাও এই শিলাস্তরে ফাটল ধরলে সেই জল বাইরে বেরিয়ে এসে তৈরি করে জলাশয়। আর সেই জলাশয়কে ঘিরেই জন্মায় গাছপালা। শুরু হয় নানা জীবের সংসার, নিষ্প্রাণ, নিস্তরঙ্গ বালির সমুদ্রের মাঝে একটুখানি প্রাণের ছোঁয়া। তবে বিশাল মরুভূমির মাঝে মরূদ্যানের সংখ্যা খুবই কম।

মরুভূমির গাছগাছালি

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের তালিকাটি পূরণ করো—

বিষয়	কী কী দরকার	কোথা থেকে পায়
গাছপালা বেঁচে থাকার জন্য দরকার	জল	মাটির তলা থেকে
প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য দরকার		

মরুভূমিতে শুধু বালি আর বালি। সূর্যের তাপ ভয়াবহ। বাতাসে পর্যাপ্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড। কিন্তু মাটি নেই। জলের ভীষণ অভাব। এরকম অবস্থাতেও বালির বুক চিরে জন্মায় নানাধরনের গাছ। মরুভূমিতে প্রধানত দু-ধরনের গাছ চোখে পড়ে। এক ধরনের গাছ শুষ্কতাকে এড়িয়ে চলার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ে। মরে যাওয়ার আগে এই ধরনের গাছে ফুল ফোটে ও বীজ উৎপন্ন হয়। বীজগুলো অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আরেক ধরনের গাছ শুষ্কতাকে প্রতিরোধ করতে থাকে। এদের কাণ্ড রসালো হয়। অল্প জলেই এরা বেঁচে থাকে অনেকবছর। দীর্ঘদিন নিজের শরীরে জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এদের মূল, কাণ্ড হয় খুব বড়ো, আর মোটা। পাতার বদলে থাকে কাঁটা। জল যাতে বাষ্প হয়ে না বেরোতে পারে তার জন্য সারা শরীর কিউটিকল নামক আবরণে ঢাকা। বালির মধ্যে সামান্য স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকলেই, তার থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করতে পারে। বেশ কিছু গাছের মূল বালি ভেদ করে অনেক গভীরে চলে যায়। জলের খোঁজে মূল অনেক গভীরে যায়, তাই তাদের মূলত্র বেশ শক্তপোক্ত। অতিরিক্ত জল যাতে বাইরে না বেরোতে পারে পাতাগুলোর পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম। একটু বৃষ্টি হলেই আবার কিছু গাছ মাটি ফুঁড়ে ওঠে। তবে বেশিদিন বাঁচে না। অল্পদিনের আয়ুতেই গাছ ফুল-ফলে নিজেদের সাজায়। আবার কিছু গাছ আছে যারা জল ছাড়াই দীর্ঘদিন বাঁচে। এবার আমরা মরুভূমির নানা গাছের সঙ্গে পরিচিত হই।

ফণীমনসা : এই ধরনের গাছেদের মধ্যে প্রথমেই আসে ক্যাকটাসের নাম। সারা গায়ে কাঁটা ভরতি। সবদেশের মরুভূমিতেই রয়েছে এই প্রিকলি পিয়ার বা সাধারণ ফণীমনসা গাছ। গায়ে কাঁটা থাকায় অন্যান্য পশু-পাখিরা খেতেও পারে না। কাঁটা হলো ওদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। সবুজ রঙের কাণ্ড।

যশুয়া গাছ : প্রায় পনেরো থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা হয় এই গাছ। প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। হলুদ-সবুজে ফুল ধরে। ঘন্টার মতো দেখতে। তবে গন্ধটা ভালো নয়। ফলগুলো আবার সবুজ আর খয়েরি। এই গাছের মূলটাও বেশ অন্যরকম। একধরনের মূল জল সঞ্চয় করে স্ফীত হয়ে কন্দ তৈরি করে। আর এক ধরনের মূল গভীরে চলে যায় জলের খোঁজে। পাতাগুলো কাঁটা কাঁটা। মানুষ এই গাছের ছালকে থালা, বাটি হিসাবে ব্যবহার করে।

সাগুয়ারো গাছ : দৈত্যাকার ক্যাকটাস সাগুয়ারো, প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু, প্রায় 200 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। পাতার বদলে কাঁটা ভরতি। পত্ররন্ধ্রের সংখ্যাও কম। প্রায় ছয় থেকে আট টন জল শরীরে জমিয়ে রাখতে পারে। জল সংগ্রহ করে বৃষ্টি থেকে। সাগুয়ারো সেজে ওঠে রাতে। হলুদ ফুলে ভরে ওঠে সারা শরীর। আলো ফোটার সঙ্গে ফুলগুলি চুপসে যায়। মরু অভিযাত্রীরা জল তেষ্টা মেটাতে এই গাছ ব্যবহার করে। গাছের বেরিয়ে থাকা কান্ড কেটে জল বার করে খায়। এর ফল ব্যবহার হয় জ্যাম তৈরিতে। কাঠের শক্ত দড়ি, বাড়ি তৈরিতেও কাজে লাগে।

মেশকুইট গাছ : এই গাছে কিন্তু পাতা আছে। নিজের শরীরে এরা জল ধরে রাখতেও পারে না। তাহলে বেঁচে থাকে কী করে, বালি ভেদ করে গভীর শিলাস্তর পর্যন্ত মূল পাঠিয়ে দেয়। সেখানকার জলস্তর থেকে জল সংগ্রহ করে দিব্যি বেঁচে থাকে। তবে এরা বালিয়াড়ির কাছে জন্মায়। মরুভূমির বালিয়াড়িকে রক্ষা করে।

খাবার হিসাবে ক্যাকটাস : মরুভূমির মানুষদের কাছে ক্যাকটাস খুব প্রয়োজনীয় গাছ। ক্যাকটাসের মূলে জমা থাকে খাবার। তাই সেগুলো বেশ বড়ো আর মোটা। মরুভূমির বালির নীচে লুকিয়ে থাকা মূল বালির সজ্জা দেখে বুঝে নেয় মরুভূমির মানুষ। অনেক ক্যাকটাস মানুষের খাবারের জোগানও দেয়। সাগুয়ারো গাছের ফল তরমুজের মতো দেখতে।

বাড়িতে ও আশেপাশে তোমরা ক্যাকটাস দেখেছ। তোমার দেখা ক্যাকটাসের ছবি আঁকো। তারপর দলে আলোচনা করে নীচের তালিকা পূরণ করো।

মূল	কাণ্ড	কাণ্ডের রং	পাতা	ফুল	ফল	কী কাজে লাগে

মরুভূমির প্রাণী

মরুভূমিতে উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে প্রাণীদের জীবন আরও দুঃসহ। এরা সরাসরি সূর্যের বিকিরিত তাপ গ্রহণ করে। পাথর ও মাটি থেকে পরিবহণ পদ্ধতিতে এবং বাতাস থেকে পরিচলন পদ্ধতিতে এদের দেহে তাপ প্রবেশ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জল না পাওয়ার সমস্যা। এর মধ্যেও উটের মতো কোনো কোনো প্রাণী গঠনগত,শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে এখানে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে।

1) বলোতো উটের কুঁজে কী থাকে?

2) মরুভূমিতে যাতায়াতে উট প্রধান ভরসা, এই উটকে কী বলে ?

মরুভূমিতে যেদিকে তাকাবে শুধু বালি আর বালি। দিনের বেলায় ভয়াবহ উত্তাপ, রাতের বেলা ঠান্ডা, কোথাও যেন প্রাণের চিহ্ন নেই। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির রূপ যায় পালটে। বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে নানা ধরনের জীবজন্তু, সাধারণত বালির উপর দাপিয়ে বেড়ায়। ভোর হলেই অদৃশ্য, তবে বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের দিনের বেলাতেও দেখা যায়। বেশিরভাগ মরুপ্রাণী আকারে ছোটো হয়। বালির নীচে লুকিয়ে থাকে। তারা জলের অভাব পূরণ করতে শিকার ধরে।

উট : বেশ বড়ো প্রাণী, দু-ধরনের হয়। এক কুঁজ-বিশিষ্ট (অ্যারাবিয়ান) আর দুই কুঁজ-বিশিষ্ট (ব্যাক্ট্রিয়ান)।

মরুভূমিতে যাতায়াতের প্রধান ভরসা, খুব কষ্ট করতে পারে। পিঠের কুঁজটা কিন্তু জল সঞ্চয়ের থলি নয়। এটা হলো চর্বি সঞ্চয় করে রাখা শরীরে একটা অংশ। এই চর্বি থেকে উট শক্তি জোগাড় করে। উট প্রায় 7 দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারে। উটের হাঁটুর কাছে আর পেটের নীচে মোটা চামড়ার আস্তরণ আছে যা বালিতে বসতে সাহায্য করে। মরুভূমিতে মাঝে মাঝেই মরুঝড় হয়। বালিতে বালিতে চারদিক অন্ধকার। উটের তার নাকের ফুটো প্রয়োজনে বন্ধ করতে ও খুলতে পারে, চোখের পাতা স্বচ্ছ। চোখের ওপরে ভুরু ছোটো মোটা ঝোপের মতো। উটের ঠোঁট এবং জিভ শক্ত পেশি দিয়েই তৈরি, যাতে কাঁটা ঝোপ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। উটরা প্রায় পঁচিশ গ্যালনের মতো জল একসঙ্গে পান করতে পারে। এদের দেহে ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। যাতে শরীর থেকে বেশি জল বেরিয়ে না যায়, তাই এদের মূত্র ঘন হয়। এদের পা অনেকটা চওড়া। আর পায়ের পাতা বেশ পুরু। ওপরের তথ্যগুলো থেকে নীচের বক্তব্যের যথার্থতা বিচার করো—

কোনো একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের জীবের উপস্থিতি ওই অঞ্চলের আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। উটের মতো অন্যান্য যে সকল প্রাণীরা মরুভূমিতে থাকে তারা কীভাবে তাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে?

1. কোনো কোনো প্রাণী কেবল রাতের বেলায় বের হয়।
2. কোনো কোনো প্রাণী খুব ভোরে বা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় কেবল কয়েক ঘণ্টার জন্য সক্রিয় হয়।
3. কোনো কোনো প্রাণী গরমকালে শুষ্ক জায়গা থেকে উঁচু ঠাণ্ডা জায়গায় চলে যায়। আবার শীতকালে চলে আসে।
4. তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেলে কোনো কোনো প্রাণী এস্টিভেশন বা গরম ঘুমে চলে যায়। এসময় তাদের শ্বাসক্রিয়া, হৃদকম্পনের হার কমে যায়।
5. কোনো কোনো প্রাণীর ত্বক অপেক্ষাকৃত পুরু হয় যাতে জল বেরিয়ে না যেতে পারে।
6. কোনো কোনো প্রাণীর পা খুব লম্বা হয়, যাতে দ্রুত দৌড়োতে ও অনেকটা উঁচু পর্যন্ত লাফাতে সুবিধা হয়। এতে তপ্ত বালির সরাসরি সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা কমে।

মরুভূমির গিরগিটি : এরা খুব একটা লম্বা নয়। তবে একটু চওড়া গোছের। এরা দিনের বেলায় বালির মধ্যে ঢুকে থাকে। সন্ধ্যের দিকে বেরিয়ে আসে খাবারের খোঁজে । যখন বালির ওপর দিয়ে ছুটে যায় মনে হয় যেন বালির উপর দিয়ে সাঁতার কাটছে। এদের চওড়া লেজে চর্বি সঞ্চয় করা থাকে। চোখের পাতা স্বচ্ছ চামড়া দিয়ে ঢাকা। পোকামাকড় খেয়েই বেঁচে থাকে।

র‍্যাটল সাপ : মরুভূমির সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ। লেজের কাছে ফাঁপা ঝুমুরের মতো ঝুমঝুমি বা Rattle দেখা যায়। খুবই ভালো সাঁতার কাটতে পারে। যত বয়স হয় তত এদের ঝুমঝুমি বা Rattle লম্বা হয়। এদের শরীরে ঠান্ডা রক্ত থাকে, শরীরে শুকনো আঁশ রয়েছে। এই সাপের জিভ খুবই সক্রিয়। দুটো ফাঁপা বিষদাঁত রয়েছে। এরা মাংসাশী প্রাণী। রাতের বেলা বের হয়। শিকারের ওপর বিষ ঢেলে দেয়। মাংস নরম হয়ে যায়, তারপর খায়। তবে এদের শত্রু হলো ঈগল।

জারবিল : ছোটো, ইঁদুরের মতো প্রাণী । বালি খুঁড়ে বালির ভেতর থাকে। রাতের বেলা বের হয়। এরা ক্যাঙারুর মতো লাফাতে পারে। এদের ক্যাঙারু ইঁদুরও বলা হয়। এরা কোনোরকম জল না পান করেই সারা জীবন থাকতে পারে। এদের লম্বা লেজ থাকে। সাদা থেকে খয়েরি রঙের হয়। তবে শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য বালির মতো রং ধারণ করতে পারে। এদের কান খুব সক্রিয়। এরা সাধারণত ঘাস বীজ, ছোটো শস্য,ফল, ছোটো ছোটো পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে, খাবার থেকেই জল পায়। এমনকি বালির নীচে খাবার জমিয়েও রাখে।

থর মরুভূমিতে এমন কিছু প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় যা অন্য মরুভূমিতে দেখা যায় না। থর মরুভূমির একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী হলো কৃষ্ণসার হরিণ। এছাড়া এক ধরনের বুনো গাধা আছে যাদের গায়ের রং বালির রঙের সঙ্গে মিশে যায়। থর মরুভূমির সবচেয়ে বড়ো পাখি হলো 'বাস্টার্ড'। রয়েছে ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর। এত ময়ূর ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। চিল, ঘুঘু, বালি মোরগও রয়েছে এখানে।

মরুভূমিতে থাকা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আচরণ তোমরা জানলে। এবার তোমরা আলোচনা করে মরুভূমিতে বেঁচে থাকা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের তালিকা তৈরি করো। তারপর তাদের বেঁচে থাকার জন্য শরীরের কোন কোন অংশ সক্রিয় তা উল্লেখ করো।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নাম	মরুভূমিতে বেঁচে থাকার জন্য প্রধান অঙ্গ	কারণ
1. ফণীমনসা		
2. উট		
3. জারবিল		
4. অস্ট্রিচ		
5.		
6.		
7.		

মরুভূমিতে মানুষ

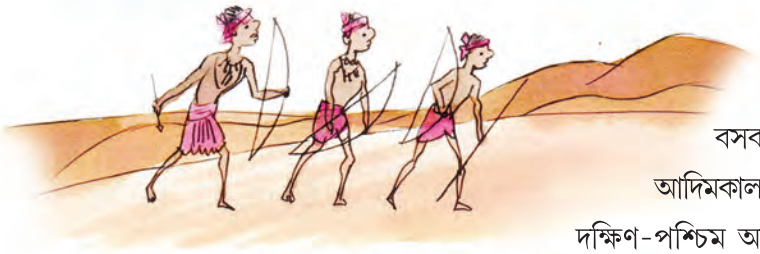

মরুভূমির মতো শুকনো অঞ্চলে মানুষ কীভাবে বাঁচবে? মরুভূমি কী মানুষের বসবাসের উপযোগী হতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই, আদিমকাল থেকেই মানুষ মরুভূমিতে বাস করে আসছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নামিব মরুভূমিতে বসবাসকারী মানুষদের বুশম্যান বলে। এরা বালির ভেতরে গর্ত করে থাকে। তিরধনুক নিয়ে প্রাণী শিকার করে। তারপর সেই প্রাণী ঝলসে খায়। কালাহারি মরুভূমিতে বসবাসকারী মানুষদের স্যান বুশম্যান (San Bushman) বলে। এরা ভিজে বালির মধ্যে গর্ত করে নলাকার ঘাস ঢুকিয়ে জল টেনে খায়। অস্ট্রিচের ডিমের খোলককে জল খাবার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এরা মরুভূমির বালি সজ্জা দেখে বলে দিতে পারে বালির তলায় জল আছে বা নেই। সাহারা মরুভূমির আদিবাসী তুয়ারেগরা ঘাস দিয়ে ঝুপড়ি তৈরি করে থাকে। মাটির নীচেও এদের ঘরবাড়ি হয়। মাটির নীচে সুড়ঙ্গ তৈরি করে সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করে।

আমেরিকার মরু অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানরা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। সবাই মিলে বাড়ি বানায়, প্রতিটি বাড়িতে বেশ কয়েকটা ঘর থাকে। পাথরের তৈরি এই বাড়িগুলিকে পুয়েবলা বলে।

থর মরুভূমিতে যারা থাকে তাদের মধ্যে ওয়াধা, ভীল, গাদি-লোহার সম্প্রদায়ের মানুষেরা উল্লেখযোগ্য। এরা মূলত যাযাবর।

সাহারা ও আরব মরুভূমির বেদুইনরা সারা শরীর লম্বা- ঢিলে ঢালা পোশাকে ঢেকে রাখে, যাযাবরের মতো উটের পিঠে চেপে মরুভূমির ওপর মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে কিছুদিন তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার শুরু হয় পথ চলা।

খাতায় ভারতের মানচিত্র আঁকো। তারপর ভারতের মরু অঞ্চল চিহ্নিত করো।

মরু প্রসার রোধে কী কী ভূমিকা গ্রহণ করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করো।

ইউনাইটেড নেশনস-এর পক্ষ থেকে 2006 সালকে 'আন্তর্জাতিক মরুভূমি ও মরুকরণবর্ষ' রূপে ঘোষণা করা হয়। মাটির ক্ষয় ক্রমশ বেড়ে চলায় ও মাটির জৈব উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকায় মরুভূমির বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ

মেরু অঞ্চল বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝায়?

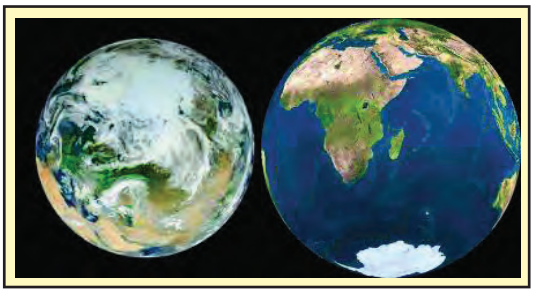

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে যে ভৌগোলিক অঞ্চল অবস্থান করে তাই হলো মেরু অঞ্চল। উত্তর মেরুকে ঘিরে থাকা অঞ্চল আর্কটিক বা সুমেরু ও দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে থাকা অঞ্চল অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু নামে পরিচিত।

আর্কটিক অঞ্চল হলো প্রায় সমস্ত সুমেরু মহাসাগর ও তাকে ঘিরে ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উত্তরাংশের দেশ বা তাদের প্রান্তসীমাসমূহ। অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চল হলো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ ও তাকে ঘিরে থাকা কুমেরু মহাসাগরের অংশবিশেষ অঞ্চলসমূহ।

টুকরো কথা

গ্রীষ্মের ঠিক মধ্যভাগে আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিকের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে প্রায় 24 ঘণ্টা সূর্যের আলো থাকে। আর শীতের মধ্যভাগে এর ঠিক উলটো ঘটনা ঘটে, 24 ঘণ্টা জুড়ে শুধুই অন্ধকার।

আর্কটিক বা সুমেরুর জীবজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জলজ স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিমি, সিল, সি লায়ন,বলগা হরিণ, কুকুর ও ডলফিন। এছাড়াও মেরু ভালুক, আর্কটিক টার্ন নামক পাখি ও মস, ঘাস, লাইকেন, বার্চ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

কী করে এত ঠান্ডাতেও সুমেরুর প্রাণীরা বেঁচে থাকে?

- শীতঘুম (Hibernation)

সুমেরুতে ঠান্ডা শুরু হওয়া মাত্র স্থলবাসী অনেক প্রাণী 'শীতঘুমে' চলে যেতে শুরু করে। এই সময় এরা চলাফেরা করে না। দেহের তাপমাত্রা খুব কমে যায়। হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়ার হার কমে যায়। কোনো কোনো শীতঘুমে যাওয়া প্রাণী আবার গর্তের মধ্যে খাবার জমিয়ে রাখে।

- পরিযান (Migration)

এক বাসস্থান ছেড়ে অন্য বাসস্থানে যাওয়াই হলো পরিযান। ম্যাপ বা কম্পাসের সাহায্য ছাড়াই নানা প্রাকৃতিক চিহ্ন (পর্বত, নদী, তটরেখা, উদ্ভিদ, বায়ুর গতিপ্রকৃতি) দেখে সুমেরুর বহু পাখি, বলগা হরিণ খাদ্যের সন্ধানে বা বাচ্চা দেওয়ার জন্য ঠান্ডা জায়গা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় পাড়ি দেয়। আর্কটিক টার্ন-রা প্রায় 11,000 মাইল পাড়ি দিয়ে সুমেরু থেকে কুমেরুতে পৌঁছোয়।

কখন সুমেরুর প্রাণীরা বাচ্চা দেয় বা ডিম পাড়ে?

সুমেরুর শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডায় বেশিরভাগ জীবই বাচ্চা দেয় না। কারণ বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। তাই বসন্তের শেষ থেকে প্রাণীরা নিজেদের অঞ্চল নির্দিষ্ট করে নেয়। আর স্বল্পস্থায়ী গরমের দিনগুলোতে বাচ্চা দেয় বা ডিম পাড়ে। এসময় গাছে গাছেও ফুল আসে যাতে শরতের আগেই গাছের বীজ দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

মেরু ভালুকরা আবার বাচ্চা দেওয়ার জন্য শীতকালকে বেছে নিয়েছে। এরা শীতকালে শিশু ভালুকের জন্ম দেয়। শীতের মাসগুলোতে বরফগুহায় এদের লুকিয়ে রাখে। এসময় শিশুরা মা ভালুকের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে। বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে এরা গুহা থেকে বেরিয়ে আসে।

মেরু ভালুকেরা কীভাবে সুমেরুতে বেঁচে থাকে?

তোমরা কী কখনও বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া মেরু ভালুকের ছবি দেখেছ? এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। ভালুকদের গায়ের সাদা লোম বরফ ও তুষারের রং -এর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সহজে এদের চলমান অবস্থায় চেনা যায় না। এর ফলে শিকারের ওপর এদের অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে সুবিধা হয়। এদের লোমের তন্তুগুলো খুব স্বচ্ছ যা সূর্যের আলো শোষণ করে তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে এদের শরীর গরম থাকে। প্রবল ঠান্ডাকে আটকানোর জন্য এদের চামড়ার ওপর ঘন লোমের দু-দুটি আস্তরণ থাকে। আর শরীরের একদম নীচের চামড়া কালো রঙের। ফলে সূর্যের তাপ যতটা সম্ভব ধরে রাখা সম্ভব হয়।

প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য মেরু ভালুকের আরেকটি হাতিয়ার হলো ফ্যাট। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে এদের চামড়ার নীচে প্রায় 10 cm পুরু ফ্যাট থাকে। সেজন্য এরা সহজে জলে ভেসে থাকতে পারে।

জলে সাঁতার কাটার জন্য মেরু ভালুকের সামনের পায়ের থাবাগুলো আংশিকভাবে জোড়া থাকে। বড়ো ও ভারী সামনের পা-ও একাজে তাদের সাহায্য করে। এছাড়া এদের চোখও জলের অনেক নীচের জিনিস দেখতে ও চিনতে সাহায্য করে।

ভালুকের পা বরফের জুতোর মতো। এদের পায়ের তালুতে যে বিশেষ ধরনের লোম থাকে তা বরফ ও তুষারের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় হড়কে যাওয়া থেকে আটকায়। আর এদের ঘ্রাণগ্রহণ ক্ষমতাও অনেক বেশি। প্রায় 32 km দূরে থাকা কোনো সিলের গন্ধও এরা শুঁকতে পারে। মেরু ভালুকদের কোনো প্রাকৃতিক শত্রু নেই। কিন্তু জীবজগতের তিনটি আশঙ্কাজনক প্রাণীর মধ্যে (বাঘ, গরিলা, মেরু ভালুক) এটি অন্যতম।

মেরু ভালুকের সামনে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে যে হারে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করছে, তাতে এদের বাসস্থান ও বিচরণক্ষেত্র ক্রমশই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আর বহু বছর ধরে লোম, চামড়া, নখের জন্য এদের শিকারও করা হয়েছে।

মাছেরা কীভাবে সুমেরুর কম তাপমাত্রায় বেঁচে থাকে?

সুমেরু মহাসাগরের জলে প্রায় 240 ধরনের মাছ থাকে। শুষ্ক মিষ্টিজলের পুকুর বা নদীতে ওপরের জল জমে বরফ হয়ে গেলেও নীচের স্তরের জল তরল থাকে। আর তাতে মাছেরা দিব্যি বেঁচে থাকে। আর নোনাজলের সমুদ্রে হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা নেমে গেলেও জলের নুন এদের দেহকে জমে যেতে বাধা দেয়। আর এদের দেহে কিছু অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে যা দেহের ভেতরে জলকে বরফ হতে বাধা দেয়।

মেরু অঞ্চলের মানুষ

আর্কটিক মেরু অঞ্চলে আমরা আজ যাঁদের স্থায়ীভাবে বাস করতে দেখি তাঁরা হলেন এস্কিমো। 'এস্কিমো' শব্দের অর্থ হলো 'যারা কাঁচা মাংস খায়।' এঁদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়া থেকে একটি ভূ-সংযোগ অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন যার আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

এস্কিমোরা মাত্র এক ঘন্টায় বরফ দিয়ে তাঁদের 'বরফবাড়ি' বা ইগলু বানিয়ে ফেলেন। এস্কিমোরা সবসময় কিন্তু ইগলুতেই থাকেন তা না। দূর গন্তব্যে চলার পথে কানাডার এস্কিমোরাই একমাত্র এধরনের 'বিশ্রাম আবাস' তৈরি করে।

এস্কিমোদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য। উত্তর মহাসাগরের ঠান্ডাজলের সিল, স্যামন, কডমাছ হলো এদের প্রধান খাদ্য। সেইসঙ্গে এঁরা হাঁস, খরগোশ, মেরু শিয়াল এমনকি মেরু ভালুক ও তিমি শিকার করে মাংস খান।

এস্কিমোদের জীবনের অপরিহার্য হলো কুকুর। পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এস্কিমোদের শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয়। আর তা খালি পায়ে ঘোরা সম্ভব নয়। তাই এস্কিমোদের কুকুরে টানা স্লেজগাড়ির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া শিকার চিহ্নিত করতেও কুকুরদের ঘ্রাণশক্তিকে এস্কিমোরা ব্যবহার করেন।

অ্যান্টার্কটিক মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ

দক্ষিণ মেরুতে উত্তর মেরুর মতো সিল, তিমি, ডলফিন দেখা গেলেও মেরু ভালুক নেই। আর দেখা যায় পেঙ্গুইন যা উত্তর মেরুতে অনুপস্থিত।

পেঙ্গুইন—অ্যান্টার্কটিকার বিস্ময়

অ্যান্টার্কটিকায় যে সকল পেঙ্গুইন প্রজাতি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো এম্পারার পেঙ্গুইন।

এম্পারার পেঙ্গুইনের জীবন ইতিহাস বিস্ময়কর কেন?

পেঙ্গুইনদের মধ্যে বৃহত্তম হলো এম্পারার পেঙ্গুইন। এরা বরফ ও জল উভয় জায়গাতেই থাকে। শীতকালে অ্যান্টার্কটিকায় যখন প্রবল হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা, ঘন অন্ধকার নেমে আসে, তখনই এম্পারার পেঙ্গুইন বংশবিস্তার করে। এরা একটিমাত্র ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পরে মেয়ে পেঙ্গুইন খাবার খুঁজতে দূরের সমুদ্রে চলে যায়। পুরুষ এম্পারার পেঙ্গুইন ওই ডিমটিতে তা দেয়। পুরুষ পেঙ্গুইন তার দু-পায়ের সঙ্গে একটি চামড়ার ভাঁজের নীচে ডিমটিকে ধরে রাখে। ডিমে তা দেওয়ার সময় হলো প্রায় দু মাস। এসময় পুরুষ এম্পারার পেঙ্গুইনরা অনেকে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে। দীর্ঘ সময় কিছু না খাওয়ার ফলে এদের ওজন খুব কমে যায়। কিন্তু ডিম ফুটে বেরোনো বাচ্চাকে পুরুষরাই প্রথম খাওয়ানোর দায়িত্ব নেয়। তারপর মা ও বাবা দুজনেই বাচ্চাকে বড়ো করার দায়িত্ব নেয়। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময় বরফখণ্ডে বাচ্চা পাখিরা চড়ে বসে এবং জীবনে প্রথমবার জলের সংস্পর্শে আসে। তখন সমুদ্রের জলে থাকা বিভিন্ন প্রাণীদের ধরে খেতে শেখে।

পেঙ্গুইনের সংকট

ফ্যাটের লোভে ষোড়শ শতাব্দী থেকে মানুষ পেঙ্গুইন শিকার করতে শুরু করে। পেঙ্গুইনের তেল থেকে বিভিন্ন কারখানায় সাবান ও জ্বালানি তৈরি শুরু হয়। পেঙ্গুইনের তেল থেকে একসময় এমনকি ওষুধও তৈরি হতো। পেঙ্গুইনের পালক জামাকাপড়, টুপি, জুতো ও ব্যাগ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো। **1905 সালে আন্তর্জাতিক পক্ষী মহাসভা পেঙ্গুইনদের রক্ষা করার জন্য আবেদন জানায়। 1959** সালে **12** টি দেশ অ্যান্টার্কটিক চুক্তিতে সই করে। এর ফলে অ্যান্টার্কটিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পেঙ্গুইনদের রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

অ্যান্টার্কটিকার পরিবেশ ও দূষণ

পৃথিবীর সবথেকে কম দূষিত স্থান হলো অ্যান্টার্কটিকা। কিন্তু মানুষ সে জায়গাও দূষিত করতে শুরু করেছে। অ্যান্টার্কটিকায় যদি কোনো দূষিত পদার্থ পাওয়া যায়, দেখা যায় তার উৎস হলো পৃথিবীর অন্য জায়গায়।

মানুষের ব্যবহৃত নানা ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন ও হ্যালন জাতীয় যৌগ অ্যান্টার্কটিকার ওপরে থাকা ওজোনস্তরের ঘনত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ফলে দেখা দিয়েছে ওজোন ছিদ্র। আর ওই ছিদ্র দিয়ে ক্রমাগত অত্যন্ত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ছে। ফলে মানুষের ত্বকে ক্যানসার, চোখে ছানি পড়া ও জলে বসবাসকারী নানা আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের সংখ্যা কমার ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে।

অ্যান্টার্কটিকায় জাহাজের চলাচল ক্রমশ বাড়তে থাকায় সমুদ্রের জলে চুঁইয়ে পড়া তেল ক্রমাগত মিশে জলকে দূষিত করে চলেছে। মাছ ধরার জাল, যন্ত্রপাতি, দড়ি, বাক্সের ক্রমাগত ব্যবহার বাড়তে থাকায় পাখি ও সিলেরা যখন-তখন এতে আটকে মারা পড়ে।

নীচের ছবিগুলোতে ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মেরু অঞ্চলে কোনটি কোন ধরনের দূষণ তা চিহ্নিত করো।

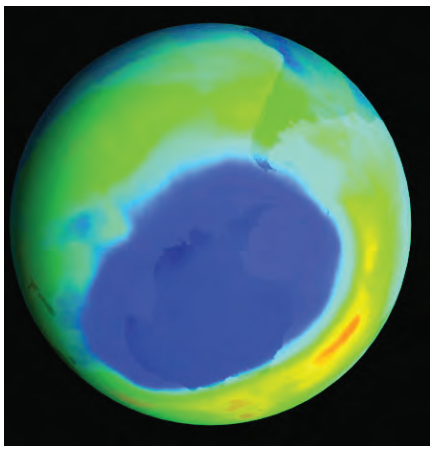

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে মানুষের জীবন নানাভাবে জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল।

কী ধরনের নির্ভরশীলতা	কোন ধরনের জীবের ওপর নির্ভর করা হয়
1) খাদ্য 2) বাসস্থান 3) পোশাক 4) জ্বালানি 5) বাণিজ্যিক উপকরণ 6) ওষুধ	

কিন্তু মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীববৈচিত্র্যের নানাভাবে সংকোচন ঘটেছে। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নানাধরনের বন্যপ্রাণীরা।

মানুষের যেসব আচরণের ফলে বন্যপ্রাণীর বিপন্নতা বাড়ছে সেগুলো হলো —

- সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার
- বন কেটে ফেলা
- বন্যপ্রাণীর বাসস্থান নষ্ট করে ফেলা
- পরিবেশকে দূষিত করা
- অন্য দেশ বা জায়গা থেকে অপরিচিত প্রজাতিকে নিয়ে আসা
- আবহাওয়ার পরিবর্তন
- শিকার করা বা
- বন্যপ্রাণীর দেহের নানা অংশকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা।

নীচের তালিকায় নাম দেওয়া প্রাণীগুলো কোন কোন পরিবেশে পাওয়া যায় এবং এদের বিপন্নতার কারণ পরের পাতার লেখাগুলো পড়ে এবং অন্যান্য সূত্রে খোঁজখবর নিয়ে নীচে লেখো।

প্রাণীর নাম	কোন কোন পরিবেশে থাকে	এদের সমস্যা
1) শকুন		
2) একশৃঙ্গ গন্ডার		
3) বাঘরোল/মেছো বিড়াল		
4) গঙ্গার শুশুক		

• এছাড়াও এরকম আরো যে অসংখ্য প্রাণী আছে যারা বিপন্ন বা বিলুপ্তির মুখোমুখি তাদের কথা জানব কী করে?

IUCN(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিপন্ন জীবদের একটি তালিকা প্রকাশ করে। এই তালিকার নাম হলো Red Data Book। এদের তালিকায় বিভিন্ন প্রজাতিকে নানাস্তরে বা ক্যাটিগোরিতে ভাগ করা হয়েছে।

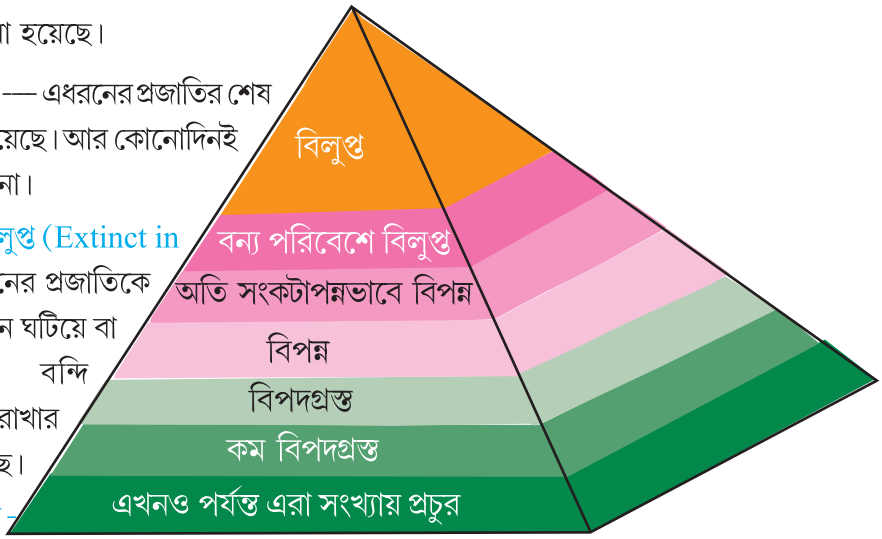

1) বিলুপ্ত (Extinct) — এধরনের প্রজাতির শেষ প্রাণীটিরও মৃত্যু হয়েছে। আর কোনোদিনই একে দেখা যাবে না।

2) বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত (Extinct in Wild) — এধরনের প্রজাতিকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটিয়ে বা চিড়িয়াখানায় বন্দি অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

3) অতি সংকটাপন্ন ভাবে বিপন্ন(Critically Endangered) — নিকট ভবিষ্যতে যে-কোনো সময়ে প্রজাতিটি স্থায়ীভাবে হারিয়ে যেতে পারে।

4) বিপন্ন (Endangered)— নিকট ভবিষ্যতে না হলেও বন্য পরিবেশে এদের বিলুপ্তির সম্ভাবনা যথেষ্টই।

5) বিপদগ্রস্ত (Vulnerable) — অদূর ভবিষ্যতে এই প্রজাতিটি হয়তো পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

6) কম বিপদগ্রস্ত (Lower Risk) — যখন কোনো প্রজাতিভুক্ত জীবের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে কম হলেও ওপরের তিনটি ক্যাটিগোরিতে (3,4,5) এদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

7) তথ্য অনুপস্থিত (Data Deficient)— এই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আলোচনা হলেও বিস্তৃতি বা সংখ্যার প্রাচুর্য নিয়ে সঠিক তথ্য অনুপস্থিত।

8) যখন কোনো প্রজাতির প্রাণীকে ওপরের কোনো মাপকাঠিতে ফেলা যায় না, তখন তাকে সমীক্ষা করা হয়নি (Not Evaluated) এমন গোষ্ঠীতে রাখা হয়।

তথ্যের অভাবে ওপরের 7 ও 8 এর ক্যাটিগোরিকে পিরামিডে স্থান দেওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের এরকম কতকগুলি বিশেষ বিপন্ন প্রাণী হলো

• রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার	• খাঁড়ির কুমির	• গঙ্গার শুশুক
• এশিয়াটিক লায়ন	• শকুন	
• একশৃঙ্গ গন্ডার	• রেড পান্ডা	
• লায়ন-টেইলড ম্যাকাক	• তুষার চিতা	

বিপন্ন জীবকে কীভাবে বাঁচানো সম্ভব

বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিপন্ন জীবকে রক্ষা করার জন্য নানা দেশে নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের জন্য গৃহীত সকল পদ্ধতিকেই একত্রে 'জিন ব্যাঙ্কস' বলা হয়। একে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় —

বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকে যখন তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে (সাধারণ বাস্তুতন্ত্র বা মানুষের তৈরি বাস্তুতন্ত্র) সংরক্ষণ করা হয় তখন ওই জীবের স্বাভাবিক বাসস্থান বা মানুষের তৈরি বনকে সংরক্ষিত বন বলে ঘোষণা করা হয়। এটা আবার নানাধরনের হয়— অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ও ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই ধরণের সংরক্ষণকে ইন সিটু (In Situ) সংরক্ষণ বলা হয়।

আবার যেসব জীবকে কোনোভাবেই তার স্বাভাবিক বাসস্থানে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে দূরে অন্য কোনো স্থানে (চিড়িয়াখানায় বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে) রেখে বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে কৃত্রিমভাবে সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। এধরনের সংরক্ষণকে এক্স সিটু (Ex Situ) সংরক্ষণ বলা হয়। এছাড়াও বিশেষত অণুজীব ও উদ্ভিদের জিন, কোশ, কলা ও বীজকে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

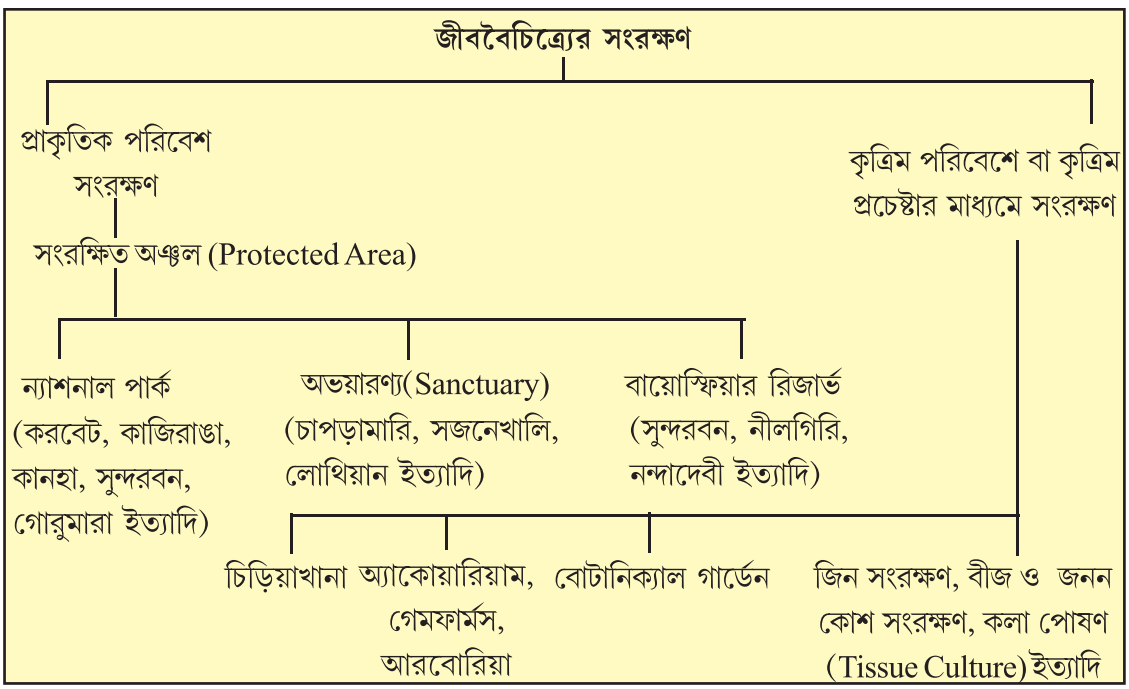

বসুন্ধরা শিখর সম্মেলন (Earth Summit)

1992 সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পরিবেশ বিষয়ক একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তার নিয়ন্ত্রণের জন্য একুশ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একে অ্যাজেন্ডা-21 বলা হয়। এর মুখ্য বিষয়গুলো হলো—স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development), বনের সংরক্ষণ, পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, জলসম্পদের সঠিক ব্যবহার, সমুদ্রের সুরক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ইত্যাদি।

কয়েকটি বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও তাদের সংরক্ষণ

IUCNএকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যাঁরা প্রকৃতিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবদের বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগে সহায়তা করেন। IUCN-এর বিচারে যেসব প্রাণীর বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবন এরকম কয়েকটি পরিচিত প্রাণীর কথা বলা হলো।

শকুন

শকুনদের বেশ বড়োসড়ো চেহারা, তবে মোটেই সুন্দর নয়। কালচে-খয়েরি শরীরের রং, রোগা, লম্বা পালকহীন বাঁকা গলা। ওই লম্বা গলা পশুর মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় খাবার সংগ্রহের জন্য। বিশ্রামের সময় তাদের পিছনদিকের সাদা অংশ দেখা যায়, আর ওড়ার সময় যখন ডানাগুলো মেলে দেয় তখন নীচের সাদা পালক দেখেই তাদের চেনা যায়।

সাফাইকর্মী শকুন

গ্রামের কিংবা শহরের শেষপ্রান্তে লম্বা বা ঝাঁকড়া গাছে শকুনরা থাকত। দল বেঁধে অপেক্ষায় থাকত কখন একটা মরা পশু আসবে। ভাগাড়ে বা অন্য কোথাও মরা পশুর দেহ পেলেই ওরা ওই পশুর ওপর বসে প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করতো, শহরের যাবতীয় আবর্জনাস্তূপ থেকে মৃত প্রাণীর শব খেয়েই ওদের জীবন চলতো। ফলে সব পচে মহামারি সৃষ্টিকারী জীবাণুরা বিস্তারলাভ করতে পারত না।

শকুনের বাসা

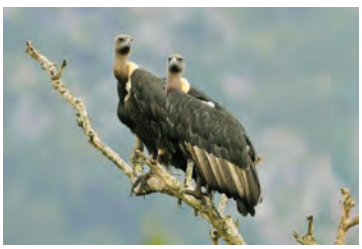

অশ্বত্থ, বট, শিরীষ, তাল, তেঁতুল, শিমুল, পাকুড় প্রভৃতি গাছের ডালে ওরা বাসা বাঁধতো । কাঠকুটো, ডালপালা জোগাড় করে ডালের খাঁজে বেশ শক্তপোক্ত বাসা ছিল ওদের। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে ওরা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। একটা পাখি একটাই ডিম পাড়ে। বহুতল বাড়ি তৈরির প্রয়োজনে গাছগুলো কেটে ফেলায় শকুনের বাসা বাঁধার জায়গা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

শকুনের হারিয়ে যাওয়ার কথা

আমাদের গ্রামেগঞ্জে ও শহরের প্রান্তে শকুনরা একসময় আকাশ কালো করে ডানা মেলে উড়তো। তাদের আর এখন দেখতে পাওয়া যায় না। হারিয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা পড়ল এক ভয়ংকর তথ্য। শকুনের দল সাধারণত মৃত পশুপাখিদের খেয়েই বেঁচে থাকে। পোষা গোরু-মোষদের বিভিন্ন অসুখে, বিশেষত হাড়ের অসুখে দেওয়া হয় এক বিশেষ ওষুধ ডাইক্লোফেনাক, ব্যথা কমানোর জন্য। তাদের মৃতদেহেও এই ওষুধ থেকে যেত। এই ডাইক্লোফেনাক শকুনের কিডনি বা বৃক্ককে নষ্ট করে দেয়। একসময় যত্রতত্র মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল শকুনের দলকে। এছাড়াও এখন আর গ্রামেগঞ্জে মরা গবাদিপশুদের ভাগাড়ে না ফেলে পুঁতে দেওয়া হয়। ফলে শকুনের খাদ্যসংগ্রহ করার সংস্থানও কমে গেছে। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে শকুনের ছানারা প্রায়ই মারা পড়ে।

শকুনের সংরক্ষণ

2006 সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার ডাইক্লোফেনাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, শকুনদের সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা শুরু হলো। শকুন অনেকদিন বাঁচে। আবার এদের জীবনের বিকাশ বেশ ধীরগতিতে হয়। তাই শকুনকে আবার তার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে বেশ কয়েক দশক লেগে যাবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় শকুন পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তার মধ্যে হরিয়ানার পিঞ্জোর এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে রাজাভাতখাওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন শকুনের সকল প্রজাতি সংরক্ষিত আছে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে।

মেছোবিড়াল (বাঘরোল)

বন্যবিড়াল

সাইবেরিয়ার বরফ-ঠান্ডা এলাকা থেকে আমাজনের সূর্যের আলো না পৌঁছোনো বর্ষাবন কিংবা লাদাখের মরুএলাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের জলাভূমি বা বাদাবন-ভূ-প্রকৃতির এবং আবহাওয়ার এই চরম বিপরীত অবস্থাতেও গোটা পৃথিবী জুড়ে যে প্রাণীরা টিঁকে আছে তারা হলো বিড়ালজাতীয় অর্থাৎ বন্যবিড়াল (Wild Cat)। বন্যবিড়াল বলতে আমরা সাধারণত বাঘ, সিংহ বা চিতাবাঘকেই বুঝি। বাঘ আমাদের জাতীয় পশু। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপশু এক বন্যবিড়াল - নাম তার মেছোবিড়াল বা বাঘরোল।

মেছোবিড়ালের গঠন, আচরণ ও বাসস্থান

আকারে বড়োসড়ো হুলোবিড়ালের দ্বিগুণ বা তারও বেশি। আর একসারি ছোটো খসখসে লোম শরীরকে রক্ষা করার জন্য। গায়ের রং মেটে ধূসর বা জলপাই রঙের সঙ্গে খয়েরি মেশানো। ধূসর রং-এর সারা গায়ে কালো লম্বায় ছোপ। আর মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত 4-6 টি কালো ডোরা রেখা নেমে গেছে। বেঁটে মোটাসোটা লেজ বরাবর কালো দাগের পটি। সামনের পায়ের আঙুলের মাঝখানের চামড়া অনেকটা জোড়া মতন। খালবিল, ঝিল, বাদাবনের জলাভূমি থেকে ঝোপজঙ্গল বা ঘনজঙ্গল - সব জায়গাতেই এদের দেখা যায়। এরা নিশাচর। সাঁতারেও খুব দক্ষ। সাধারণত মাছ শিকার করলেও কাঁকড়া, শামুক, ইঁদুর বা পাখি খেয়ে পেট ভরায়।

মেছোবিড়ালের সংকট ও সংরক্ষণ

কিন্তু যেখানে এককালে ঝোপজঙ্গল বা খড়ি, নল, হোগলায় ভরা জলাভূমি ছিল, সেখানে তৈরি হয়েছে বড়োবড়ো রাস্তা, আবাসন প্রকল্প ও শপিং মল। কোথাও তৈরি হচ্ছে কলকারখানা আর ইটভাটা। ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে বাঘরোলের বাসস্থান আর ক্রমশ কমছে তাদের প্রাকৃতিক খাবার। এর ফলে বাঘরোলরা কখনো-কখনো হাঁসমুরগির লোভে মানুষের বসতি এলাকায় চলে আসতে বাধ্য হয়। আর মানুষের হাতে মারাও পড়ে। এদের বাসস্থান সুরক্ষিত না হলে এবং এদের হত্যা করা সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে বিপন্ন এই প্রাণীটি একদিন পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

গঙ্গার শুশুক

গঙ্গার শুশুকের বাসস্থান, স্বভাব ও গঠন

মিষ্টি জলের এই স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাস গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী আর তাদের উপনদীতে। লম্বা নাক (রস্ট্রাম) আর মুখ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও ওপর আর নীচের চোয়ালে দৃশ্যমান দাঁত এদের সহজেই চিনিয়ে দেয়।

এদের চোখে কোনো লেন্স থাকে না। তাই এরা কার্যত অন্ধ। যদিও এরা আলোর দিক আর তীব্রতা বুঝতে পারে। তাহলে এরা আশেপাশে কী আছে বোঝে কী করে? খুব সম্ভবত নাসাগহ্বরে থাকা ডরসাল বার্সা নামের একটা যন্ত্রের সাহায্যে শুশুক একরকম শব্দ ছুড়ে দেয়। সেই শব্দ সামনে কোনো কিছুতে বাধা পেয়ে ফিরে এলে শুশুক সেই প্রতিধ্বনি শুনে বুঝতে পারে সামনে কতদূরে কোন ধরনের জিনিস আছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইকোলোকেশন (Echolocation)। বাদুড় বা চামচিকেরাও এই পদ্ধতিতে চলাফেরা করে বা শিকার ধরে। এছাড়াও শুশুকের ঘ্রাণশক্তি প্রবল।

এদের দেহ ধূসর বাদামি বা কুচকুচে কালো রঙের। দেহের মাঝখানটা মোটা, দু-প্রান্ত সরু আর সুচালো। এদের গায়ে লোম থাকে না। চামড়ার নীচে সঞ্চিত পুরু চর্বির স্তর (Blubber) জলের তলায় এদের শরীরকে গরম রাখে। ঘাড় না থাকায় এদের মাথা আর ধড় আলাদা করা যায় না। মুখের সামনে ঠোঁটদুটো অনেকটা চঞ্চুর মতো প্রলম্বিত। এদের প্রতিটি চোয়ালে 27-32 টা ছোটো দাঁত থাকে। শুশুকের দাঁতগুলো সব একই ধরনের। কাটা বা চিবোনোর জন্য আলাদা আলাদা ধরনের দাঁত থাকে না।

এদের নাকের ফুটো লম্বাটে, থাকে চঞ্চুর গোড়ায়। এরা নিজেদের ইচ্ছামতো এই ফুটো খুলতে আর বন্ধ করতে পারে। জলের ওপরে ভেসে উঠে বাতাস থেকে শ্বাস নেয়। শুশুকের সামনের পা দুটো ফ্লিপারে পরিণত হয়েছে। এগুলোর সাহায্যেই শুশুক জলে সাঁতার কাটে। এদের লেজটা ওপরে-নীচে চ্যাপটা।

বর্ষায় ভরা নদীতে উজান বেয়ে এরা ছোটো ছোটো উপনদীতে পৌঁছে যায়। আবার শুকনো মরশুমে নদীর মূল স্রোতে ফিরে আসে। এরা মাংসাশী। ইকোলোকেশনের সাহায্যে এরা নদীর তলায় কাদামাটিতে লুকিয়ে থাকা জীবদের শিকার করে। মাছ আর নানাধরনের জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন চিংড়ি এদের খাবার। শিকারের সন্ধান পেলে লম্বা রস্ট্রাম দিয়ে এরা শিকার ধরে।

গঙ্গার শুশুকের সংকট ও সংরক্ষণ

মানুষের নানান কাজের জন্য এদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। নদীবাঁধ আর অন্যান্য নানা কারণে নদীর জলের গভীরতা কমে যাচ্ছে। নদীর মাঝে মাঝে বালির চর জেগে উঠে নদীকে ছোটো ছোটো অংশে ভেঙে দিচ্ছে। এর ফলে গঙ্গার শুশুকরা যাতায়াতের পথে বাধা পাচ্ছে। তাই এক শুশুক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য শুশুক গোষ্ঠীর যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে আলাদা আলাদা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাওয়া শুশুকদের প্রজননে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শুশুকরা গঙ্গার এমন এক অঞ্চলে বাস করে, যার চারপাশ জুড়ে ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। তার ফলে নদীর জলে দূষণের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এছাড়াও গঙ্গার পাড়ে থাকা নানা রাসায়নিক কারখানা, তেল পরিশোধনাগার বা অন্যান্য কলকারখানার বর্জ্য থেকেও নদীর জল দূষিত হয়। জলদূষণের ফলে নদীতে মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আর খাবারের অভাবে বিপদে পড়ছে শুশুকরা। মাছ ধরার জালে আটকে পড়েও এরা মারা যায়।

গঙ্গার শুশুককে জাতীয় জলজ প্রাণী (National Aquatic Animal) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 1991 সালে বিহারের সুলতানগঞ্জ আর কাহালগাঁও-এর মাঝে গঙ্গার 60 কিমি অঞ্চল জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে পৃথিবীর প্রথম শুশুক স্যাংচুয়ারি, বিক্রমশীলা গ্যাঙ্গেটিক ডলফিন স্যাংচুয়ারি (Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary)। স্থানীয় জেলেদের মধ্যে শুশুক সংরক্ষণের সচেতনতা বাড়াতে প্রচার করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের ব্রিজঘাট থেকে নারোরা মধ্যবর্তী গঙ্গার অঞ্চলকে শুশুক সংরক্ষণের জন্য 'রামসর স্থান'(Ramsar Site), অর্থাৎ সংরক্ষিত বিশেষ জলাভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একশৃঙ্গ গন্ডার

গন্ডারের স্বভাব, গঠন ও বাসস্থান

একশৃঙ্গ গন্ডার পৃথিবীর বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ীদের অন্যতম। গন্ডারের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। কিন্তু ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল। কানের পাতা গোলমতো, ছড়ানো। এরা থাকে মূলত বন্যাবিধৌত-সমভূমি বা জলা জায়গার আশেপাশের লম্বা ঘাসের জঙ্গলে। গন্ডার সাধারণত একা থাকে। লম্বা ঘাসের জঙ্গল ঠেলে এরা এদের জল খাওয়ার জায়গা আর খাবার খাওয়ার জায়গার মধ্যে চলাফেরা করে। এই লম্বা ঘাসের জঙ্গল এদের সুরক্ষাও দেয়। এরা মূলত খুব ভোরে, সন্ধ্যায় বা রাতের দিকে চরে বেড়ায়। রোদ বেশি উঠে গেলে এরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। বেশিরভাগ সময় এরা জল-কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে সময় কাটায়। গন্ডারের গায়ের মোটা চামড়া প্রচণ্ড গরম থেকে তাকে বাঁচায়। আর তার গায়ের কাদার আস্তরণও তার দেহকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই কাদার আস্তরণের আর একটা কাজও আছে। গন্ডারের চামড়ায় বাসা বাঁধা পোকামাকড় বা পরজীবীরাও ওই কাদার আস্তরণে চাপা পড়ে যায়।

এরা মূলত শাকাশী—লম্বা লম্বা ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ, ছোটো ছোটো গাছপালা, লতাপাতা বা এমনকি ফলও এরা খায়। কোনো কারণে বিরক্ত হলে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ গন্ডার পেছনদিকে প্রায় 3-4 মিটার দূর পর্যন্ত মূত্রত্যাগ করে। গন্ডারের নীচের চোয়ালের কৃন্তক (incisor) দাঁতটা খুব লম্বা হয়। এলাকা দখল বা অন্য কোনো কারণে অন্য গন্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় এই দাঁত গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে।

পুরুষ আর স্ত্রী গন্ডার দুজনেরই নাকের ওপরে চামড়ার ওপর প্রায় 60 সেন্টিমিটার লম্বা একটা খড়্গ বা শিং থাকে। গন্ডারের খড়্গ, কী দিয়ে তৈরি জানো? কেরাটিন দিয়ে। এই কেরাটিন হলো একধরনের প্রোটিন — যা দিয়ে আমাদের নখ আর চুল তৈরি হয়। জন্মের পর বাচ্চা গন্ডারের কিন্তু খড়্গ থাকে না। গন্ডারের 6 বছর বয়স থেকে এই খড়্গ আস্তে আস্তে দেখা দিতে থাকে। কোনো কারণে ভেঙে গেলে, আবার নতুন করে গন্ডারদের খড়্গ গজায়। গন্ডার তার খড়্গ ব্যবহার করে প্রধানত খাবারের খোঁজ করতে — মাটি খুঁড়ে গাছের মূলের খোঁজে। এছাড়াও প্রজনন ঋতুতে অন্য পুরুষ গন্ডারের সঙ্গে মারামারির সময়ও সে তার খড়্গ ব্যবহার করে।

গন্ডারের লোমহীন ধূসর রঙের চামড়ার ওপরটা ঢালের মতো খাঁজকাটা। দেখলে মনে হয় ঠিক যেন গায়ে একটা বর্ম পরে আছে। বর্মে তিনটে ভাঁজ দেখা যায়, ঘাড়ের চারপাশে, কাঁধের ঠিক পেছনে আর উরুর ঠিক সামনে। দেহের পাশের দিকে, চামড়ায় বড়ো বড়ো গুটি (tubercle) থাকে। দেহের কোনো কোনো জায়গায় চামড়া প্রায় 4 সেন্টিমিটার পর্যন্ত পুরু হয়। চামড়ার নীচে প্রায় 2-5 সেন্টিমিটার পুরু চর্বির স্তর থাকে। এদের সারা দেহে লোম না থাকলেও লেজের ডগায়, কানের আশেপাশে আর চোখের পাতায় লোম দেখা যায়। লোমগুলো কর্কশ প্রকৃতির।

গন্ডারের একটা অদ্ভুত অভ্যাস হলো একই জায়গায় মলত্যাগ করা। ফলে দিনের পর দিন এই মলের স্তূপের (Dunghill) উচ্চতা বাড়তে থাকে। মলস্তূপ উচ্চতা খুব বেশি হয়ে গেলে গন্ডার আর পুরোনো স্তূপে মলত্যাগ করতে পারে না। তখন সে কাছাকাছি জায়গায় একটা নতুন মলস্তূপ তৈরি করে। আর চোরাশিকারিরা গন্ডারের এই অভ্যাসেরই সুযোগ নেয়। গন্ডারের মলস্তূপের কাছেই তারা তাদের শিকারের অপেক্ষায় থাকে।

মলের স্তূপ

ঘাসজমির বাস্তুতন্ত্র ও গন্ডার

ঘাসজমির বাস্তুতন্ত্রের ওপর একশৃঙ্গ গন্ডারের নানা প্রভাব লক্ষ করা যায়।

1. খড়্গ দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেলার ফলে নতুন নতুন বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাকৃতিক বনভূমি বা ঘাসজমির প্রাচুর্য ও প্রসার ঘটায়। তৃণভোজী নানা বন্যপ্রাণীর এবং তাদের খাদক শিকারী প্রাণীর খাদ্যসম্ভার বেড়ে যায়।

2. একশৃঙ্গ গন্ডার নানা গাছের ফল খায়। এরা একসঙ্গে এক জায়গায় মলত্যাগ করে। তারপর মল যখন অনেক উঁচু হয়ে যায় তখন খড়্গ দিয়ে তাকে সমান করে। এই মলে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান খুব বেশি পরিমাণে থাকে। তাই ফল খাওয়ার 3-7 দিন পর যখন ওই মলের ওপর বীজগুলো পড়ে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের অঙ্কুরোদগম ঘটে। ফলে ওই গাছগুলো অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। পাখিরা ওই মলমধ্যস্থ বীজগুলো যখন খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং বহুদূরে মলত্যাগ করে, তখন নতুন নতুন জায়গায় বীজ থেকে গাছ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

গন্ডারের সংকট ও সংরক্ষণ

একশৃঙ্গ গন্ডার প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রায় 35-45 বছর অবধি বাঁচে। এদের সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো চোরাশিকার। গন্ডারের খড়্গের একটা উত্তেজক গুণ আছে — এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্যই চোরাশিকারিদের লোভের শিকার হয় সে। যদিও এই বিশ্বাসের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। থাকার জায়গা বা বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়াও এদের বিপন্নতার অন্যতম কারণ। গন্ডার সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গন্ডার শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

একসময় সিন্ধু নদীর উপত্যকা থেকে মায়ানমারের উত্তর দিক পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একশৃঙ্গ গন্ডারের দেখা পাওয়া যেত। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকা অঞ্চলে (মানস, কাজিরাঙা, পবিতোরা ইত্যাদি), পশ্চিমবঙ্গের দুটো ন্যাশনাল পার্ক (জলদাপাড়া, গোরুমারা), উত্তরপ্রদেশের দুধুয়া সংরক্ষিত অরণ্যে, আর নেপালের চিতওয়ান জাতীয় উদ্যানেই কেবল এদের দেখা পাওয়া যায়।

11 আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদজগৎ

পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাছ

আমাদের চারদিকে আমরা যেসব গাছ দেখি, তাদের থেকে আমরা খাবার, ওষুধ, জামাকাপড় বা ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ জোগাড় করি। গাছ খাবার তৈরির সময় যে অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেয়, অন্যান্য জীবেরা শ্বাসকার্যের জন্য সেই গ্যাস ব্যবহার করে। গাছেরা জীবজন্তুর থাকার জায়গা আর খাবার হিসেবেও কাজ করে। এছাড়া পরিবেশ থেকে দূষক পদার্থ শুষে নিয়ে দূষণের মাত্রা কমায়, জমির সার তৈরি করে, এমনকি মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়াতেও সাহায্য করে। কোনো কোনো গাছের অংশ বা সমগ্র দেহ সার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পরিবেশের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণেও গাছেরা নানা ভূমিকা পালন করে। নানা শিল্পের উপকরণরূপেও গাছের নানা অংশ ব্যবহৃত করা হয়।

বাঁশ

বাঁশ এক ধরনের বহুবর্ষজীবী, নিরেট পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত চিরসবুজ উদ্ভিদ। এদের কাণ্ড লম্বা নলের মতো এবং শাখাপ্রশাখার পরিমাণ কম। পৃথিবীতে যে সমস্ত গাছ খুব দ্রুত বাড়ে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বাঁশ। প্রতি 24 ঘণ্টায় কোনো কোনো বাঁশের প্রায় 100 সেমি বৃদ্ধি হয়। সব ঋতুতে এবং সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে এর বৃদ্ধির হার সমান নয়।

টুকরো কথা

অধিকাংশ বাঁশে অনিয়মিতভাবে ফুল আসে। অনেক বাঁশগাছে 65 বা 120 বছর অন্তর অন্তর ফুল ফোটে। বাঁশগাছে ফুল ফোটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মত চালু আছে। কেউ কেউ বলেন যে পরিবেশগত প্রভাবে বাঁশগাছে যখন **বিপদ ঘন্টা** বাজতে থাকে, তখন বাঁশগাছ তার অঙ্গজ বৃদ্ধি বন্ধ করে জননগত বৃদ্ধি ঘটায়। তখন তার দেহের সমস্ত শক্তিকে ফুল ফোটানোর কাজে ব্যবহার করে। ফুল ফোটার পরই বাঁশগাছের মৃত্যু হয়। বাঁশ গাছে যখন **Mass flowering** ও ফল হওয়ার ঘটনা ঘটে তখন সেই অঞ্চলে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের অত্যধিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। তারা তখন শস্যক্ষেত্রের, ও গুদামের শস্য খেয়ে ও শস্যহানি ঘটিয়ে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। আর টাইফাস, প্লেগ ও অন্যান্য ইঁদুরবাহিত রোগের সম্ভাবনাও বেড়ে যায় এবং এর থেকে মহামারি পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে প্রচুরসংখ্যক বাঁশের একসঙ্গে মৃত্যু ঘটার ফলে নতুন বাঁশ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় মানুষ আর এক সমস্যার মুখোমুখি হয়। ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ না পেয়ে বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর জন্মানো বাঁশের একটি প্রজাতি হলো *Melocanna bambusoides*। এতে প্রতি 30-35 বছর অন্তর অন্তর ফুল ফোটে ও ফল আসে। তখন এই ক্ষতিকারক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কী কী প্রয়োজনে বাঁশ ব্যবহার করা হয়?

i) বাঁশের নরম কাণ্ড, গোড়া আর পাতা হলো বিশ্বের বিপন্নতম প্রাণীগুলোর অন্যতম প্রধান খাদ্য। (চিনের জায়েন্ট পান্ডা, নেপালের ও ভারতের রেড পান্ডা এবং মাদাগাস্কারের লেমুর)। আফ্রিকার গরিলাদেরও অন্যতম প্রধান খাদ্য হলো এই বাঁশ। শিম্পাঞ্জি ও হাতিরাও বাঁশকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

ii) লাওস, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও চিনের য়ুনান প্রদেশে জন্মানো বাঁশের গোড়ায় একধরনের পোকা জন্মায়। এরা বাঁশের নরম কাণ্ড খায়। আর স্থানীয় মানুষ এই পোকার লার্ভাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

iii) বাঁশের গোড়া থেকে বেরোনো নতুন কচি কাণ্ড এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যদিও ব্যবহারের আগে এর মধ্যে থাকা অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্কাশন করে দেওয়া হয়। বাঁশের এই নরম কচি কাণ্ড থেকে নানা পানীয় প্রস্তুত করা হয়।

iv) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায় স্যুপকে গরম করা ও ভাত রান্নার পাত্ররূপে বাঁশের ফাঁপা কাণ্ডকে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রান্নার কাজে বাঁশের তৈরি নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

v) ভারতবর্ষে বাঁশ কাগজ তৈরি, ঝুড়ি বা চুপড়ি, ছাতার বাট, ফুলদানি, ট্রে, বাঁশি, নানা ধরনের খেলনা এবং এমনকী ঘরসাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

vi) *Bambusa arundinacea* নামক বাঁশের পর্বমধ্যে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ও সিলিসিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ 'তবাশির' (Tabashir) নামক এক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ প্রস্তুত হয় যা হাঁপানি, সর্দিকাশি ও নানা সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

vii) দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে বাঁশ হলো মানুষের ঘরবাড়ি তৈরির অন্যতম উপকরণ। এছাড়া নদীর ওপর সাঁকো তৈরির কাজেও হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বাঁশকে ব্যবহার করে চলেছে।

viii) বাঁশের তন্তুর ব্যাস 3 মিমি-র কম। তাই 'bamboo fabric'-কে ইদানীং জামাকাপড় তৈরির কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

কচুরিপানা

কচুরিপানা একটি জলে ভাসমান বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। প্রতিটি গাছে বছরে প্রায় 1000 -এর বেশি বীজ তৈরি হয় এবং এরা প্রায় 24 বছর বেঁচে থাকে। এর বংশবৃদ্ধির হার এতই বেশি যে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। উত্তর আমেরিকায় 1884 সালে যখন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে একে প্রথম আনা হয়েছিল তখন প্রতি বর্গমিটারে জন্মানো 50 কেজি কচুরিপানার জন্য ফ্লোরিডার সমস্ত জল চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যদি কচুরিপানার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে পুকুর ও হ্রদের জলকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঢেকে দেয়। ফলে জলের প্রবাহ কমে যায়, অন্যান্য উদ্ভিদদের সূর্যের আলো পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে এবং জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। এতে জলে থাকা মাছ ও কচ্ছপদের মৃত্যু হয়। অতিসংখ্যায়

কচুরিপানার জঙ্গলে বংশবৃদ্ধি করে এডিস মশারা। একধরনের শামুক আছে যা মানুষের এক মারাত্মক কৃমিঘটিত রোগ ছড়ায়। এই শামুকও কচুরিপানার জঙ্গলে বাস করে। মানুষের নানাবিধ কার্যাবলির ফলে যেসব জলাশয়ে পুষ্টি পদার্থের জোগান বেড়ে যায় সেখানে কচুরিপানার বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ে। গ্রামগঞ্জের জলাশয়ে কচুরিপানার সংখ্যাবৃদ্ধি এক জ্বলন্ত সমস্যা।

মশার লার্ভা

কী কী প্রয়োজনে কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কচুরিপানাকে নানাভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

i) ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে কচুরিপানার কাণ্ডকে এমব্রয়ডারির কাজে ব্যবহার করা হয় এবং বস্ত্রশিল্পের তন্তুর উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়। শুকনো কাণ্ডকে ব্যবহার করে ঝুড়ি ও নানা ফার্নিচার বানানো হয়। কচুরিপানার তন্তুকে কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

ii) কচুরিপানায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকায় এটিকে বায়োগ্যাসের উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়।

iii) কচুরিপানার সহ্যক্ষমতা অত্যধিক বেশি। ভারী ধাতুর শোধনক্ষমতা বেশি হওয়ায় বের হওয়া নোংরা দূষিত জল থেকে ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট , নিকেল, লেড ও মার্কারির মতো ক্ষতিকারক ধাতুকে শোধন করতে পারে। ফলে জল দূষণমুক্ত ও ব্যবহার উপযোগী হয়।

iv) সোনার খনি অঞ্চলে জলে নির্গত সায়ানাইড শোষণ করে জলকে বিষমুক্ত করে। আর্সেনিকসমৃদ্ধ পানীয় জল থেকে কচুরিপানা আর্সেনিককে অপসারিত করে।

v) নাইট্রিফিকেশন পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণে কচুরিপানার মূলে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

vi) কচুরিপানায় নাইট্রোজেন তথা প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকায় পশুখাদ্য রূপে এর কদর ক্রমশ বেড়েছে। এর অতিরিক্ত ব্যবহার কিন্তু বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সার হিসেবেও একে নানা জায়গায় ব্যবহারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শাল

শাল একটি বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল, দ্বিবীজপত্রী ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি একটি পর্ণমোচী জাতীয় গাছ যা পরিণত হতে প্রায় 25 থেকে 30 বছর সময় নেয়। শালগাছের জঙ্গলে বাঘ, হাতি, চিতাবাঘ, ভালুক, বুনো খরগোশ, বুনো শুয়োর ইত্যাদি প্রাণী বেশি চোখে পড়ে ।

কী কী প্রয়োজনে শালগাছ ব্যবহার করা হয়?

i) **কাঠ** - খুঁটি, আসবাবপত্র, জানালা-দরজার কাঠের ফ্রেম, পাটাতন, নৌকা, জাহাজের জেটি, সেতু প্রভৃতি তৈরি করার জন্য শক্ত ও টেকসই কাঠ পাওয়া যায় শালগাছ থেকে। গাছ থেকে কাটার সময় কাঠের রং হালকা, আর কাঠ কেটে ফেলে রাখলে গাঢ় বাদামি রঙের হয়ে যায়। নির্মাণকাজে এই কাঠের চাহিদা আছে। কিন্তু এই কাঠ পালিশ করার উপযোগী নয়।

ii) **পাতা** - উত্তর আর পূর্ব ভারতে শালগাছের শুকনো পাতা দিয়ে থালা-বাটি, ঠোঙা তৈরি করা হয়। আর গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি হিসেবে এর ব্যবহার হয়। ব্যবহৃত শালপাতা বা শালপাতার থালা গোরু-ছাগলের খাবার।

iii) **আঠা** - শালগাছের আঠা থেকে সুগন্ধযুক্ত লাল ধুনো পাওয়া যায় যা ধূপ তৈরিতে, কাঠের জোড়ের স্থানে প্রলেপ দেওয়ার কাজে, জুতো পালিশ ও অন্যান্য কাজে লাগে।

iv) **রজন** - গুঁড়ি থেকে প্রাপ্ত রজন স্পিরিট ও বার্নিশ তৈরির কাজে লাগে।

v) **ট্যানিন**- ছাল থেকে প্রাপ্ত ট্যানিন চর্মশিল্পে ব্যবহৃত হয় ।

vi) **শালবীজ**- বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল প্রদীপ জ্বালাতে রান্নার কাজে ও চকোলেট প্রস্তুত করার কাজে লাগে।

সুন্দরী

সুন্দরবনের লবণাক্ত অঞ্চলে মিষ্টি জলে সুন্দরী গাছ জন্মায়। নরম মাটিতে জন্মায় এই গাছ। এই গাছের চারপাশে মাটি ভেদ করে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট মূল। প্রথমদিকে এরা বেশ নরম থাকলেও পরে শক্ত শক্ত সুচালো কাঠের মতো বেরিয়ে থাকে। এই মূলগুলো বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে সুন্দরী গাছকে বাঁচিয়ে রাখে। এই মূলগুলো সুন্দরীগাছের শ্বাসমূল। চিরসবুজ, লম্বা গাছগুলো সমুদ্রের কাছাকাছি থাকে। এই গাছকে লবণাম্বু বা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে। কাণ্ড বেশ শক্তপোক্ত তবে নরম মাটিতে আটকে থাকার জন্য কাণ্ডের নীচের দিক থেকে বাঁকাভাবে কিছু অস্থানিক মূল বেরিয়ে মাটিতে প্রবেশ করে। নরম মাটিতে গাছকে অবলম্বন দেয়। এই মূলগুলোকে ঠেসমূল বলে। পাতার ওপরের দিক সবুজ, চকচকে। নীচের দিক হালকা সবুজ। সুন্দরীগাছের ফল ডিমের মতো, তবে একটু লম্বাটে ধরনের। ফলের রং খয়েরি। প্রত্যেকটা ফলে একটা করে বীজ থাকে। ফলের মধ্যে থাকা বীজ থেকে নতুন চারা তৈরি হয়।

কী কী প্রয়োজনে সুন্দরীগাছ ব্যবহার করা হয়?

সুন্দরীগাছের কাঠ আসবাব, বাড়ি ও খুঁটি তৈরিতে কাজে লাগে। এছাড়া জ্বালানি হিসেবে এই কাঠ খুবই ব্যবহার করা হয়। গাছের ছালে থাকে প্রচুর ট্যানিন। যা চামড়া ও রং শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

প্রচুর পরিমাণে সুন্দরীগাছ পাওয়া যেত বলেই সুন্দরবন নাম হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাসস্থানের জন্য এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরীগাছ কাটা পড়েছে। এছাড়াও জলে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সুন্দরবনের সুন্দরীগাছ আজ দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে যা নষ্ট করে দিচ্ছে সুন্দরবনের প্রকৃতিকে। এটি একটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ। তাই ঝড়খালিতে সুন্দরী গাছ প্রতিপালন ও সংরক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে আইন করে সুন্দরীগাছ কাটা বন্ধ করা হয়েছে।

মশলা ও গাছ

আমাদের প্রতিদিনের রান্না করা খাবারে এত সুন্দর স্বাদ, গন্ধ কীভাবে আসে বলোতো? কী এমন জিনিস মেশানো হয় রান্নার সময় যাতে আমাদের চিরপরিচিত নানারকম শাকসবজি, মাছমাংস নিত্যনতুন স্বাদ আর গন্ধ নিয়ে হাজির হয় আমাদের খাবার পাতে! সেই জিনিসটা হলো মশলা।

ইতিহাসের পাতা উলটে গেলে দেখতে পাওয়া যায় বিদেশিদের কাছে ভারত বললেই রাজামহারাজা, হিরে, মসলিন—এইসব জিনিসের সঙ্গেই ভেসে ওঠে ভারতীয় মশলার অনন্য স্বাদ,গন্ধ আর জাদুর গল্প। অতীতে রাজারাজড়াদের কাছে দামি হিরে মণি-মুক্তোর সঙ্গেই সমান আদর পেত নানান ধরনের মশলা। এইসব মশলার হালহকিকত গোপন রাখতে তাঁরা ছিলেন সদাতৎপর। এই মশলার খোঁজেই কত নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন জলপথের দরজা খুলে গেছে মানুষের কাছে।

গ্রিস আর রোমের যখন জন্মও হয়নি, তখনও ভারতীয় মশলা, সুগন্ধি আর সূক্ষ্ম কাপড় জাহাজে করে যেত মেসোপটেমিয়া, অ্যারাবিয়া আর মিশরে। যিশুখ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই গ্রিসের ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বাজারে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত। কেন বলোতো? সেখানকার বাজার থেকে তারা কিনত মশলা আর অন্যান্য মহার্ঘ জিনিস। ভারতীয় মশলা, সিল্ক আর অন্যান্য জিনিসের জন্য রোম খরচ করত প্রচুর অর্থ।

টুকরো কথা

1497 সালে সুদূর পোর্তুগালের লিসবন থেকে চারটে জাহাজ নিয়ে এশিয়ার মশলার দেশের খোঁজে বেরিয়েছিলেন ভাস্কো-দা গামা। 24000 মাইল পথ পেরিয়ে দু-বছর পরে দুটো জাহাজ খুইয়ে অবশেষে

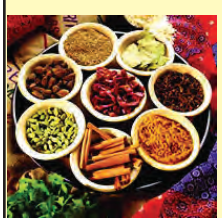

তিনি ভারতের খোঁজ পান। মাত্র ওই দুটো জাহাজে করেই তিনি যা মশলা আর অন্যান্য জিনিস দেশে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তাতেই নাকি তাঁর যাত্রার খরচের 60 গুণ বেশি অর্থ উঠে আসে! তোমরা হয়তো ভাবছ যে মশলার এত দাম! মধ্যযুগে এক পাউন্ড আদার দাম ছিলো 1 টা ভেড়ার দামের সমান। গোলমরিচ ছিল তখনকার যুগে সবচেয়ে দামি মশলা। প্রায় তিনশো বছর ধরে পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড (নেদারল্যান্ড) আর ব্রিটেন মশলার দেশগুলোর দখল নেবার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছে।

কিন্তু তখনকার দিনে কী কাজে লাগত এই মশলা? খাবারের স্বাদ বাড়ানো ছাড়াও মশলা সংরক্ষকের কাজও করতো। তখন তো আর ফ্রিজ ছিল না। তাই ঘরে মাংস সংরক্ষণের কাজে মশলা ব্যবহার করা হতো। যেমন লবঙ্গতে আছে ইউজিনল নামে এক রাসায়নিক পদার্থ। এটির ব্যাকটেরিয়ানাশক ক্ষমতা আছে। এখনকার দিনেও কোনো কোনো দেশে শুয়োরের মাংস সংরক্ষণের জন্য লবঙ্গ ব্যবহার করা হয়। তখনকার দিনে বাইরের দেশে, মশলার অভাবে, শীতের জন্য খাবার সংরক্ষণ করতে না পারলে অভুক্ত থাকতে হতো। তবেই বুঝে দেখো, মশলার চাহিদা কেন এত বেশি ছিল! আজ আমরা সেই মশলার কথাই জানব। বলোতো মশলা আমরা কীভাবে পাই? কী মনে হয় তোমাদের? নীচে লিখে ফেলো।

আমরা মশলা কীভাবে পাই

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় 80 ধরনের মশলার চাষ হয়। আর শুধু ভারতেই প্রায় 50 ধরনের মশলার চাষ হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকেই আমরা মশলা পাই। এসো একঝলকে দেখে নিই কোন কোন উদ্ভিদের অংশ থেকে আমরা কোন কোন মশলা পেয়ে থাকি।

উদ্ভিদ অংশ	মশলার নাম
1.গাছের ছাল	দারচিনি
2. মুকুল (অপ্রস্ফুটিত পুষ্পমুকুল)	লবঙ্গ
3. কন্দ	পিঁয়াজ, রসুন
4. ফুলের অংশ	জাফরান
5. ফল	গোলমরিচ, এলাচ, লঙ্কা
6. পাতা	তেজপাতা, পুদিনা
7. গ্রন্থিকাণ্ড	আদা, হলুদ
8. ক্ষরিত পদার্থ	হিং
9. বীজ	জোয়ান, মৌরি, ধনে, সরষে পোস্ত, মেথি
10. অন্তর্বীজ	জায়ফল

কী কাজে লাগে মশলা

এসো দেখে নেওয়া যাক মশলা আমাদের কী কাজে লাগে।

i) জোলো খাবারে স্বাদ আনতে সাহায্য করে।

ii) সংরক্ষকরূপে (আচার, চাটনি ইত্যাদিতে) কাজ করে।

iii) লালারসের ক্ষরণ বাড়িয়ে হজমে সাহায্য করে।

iv) মুখগহ্বরকে ক্ষতিকারক জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

এসো এবারে আমাদের চেনা কয়েকটা মশলার খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

গোলমরিচ (Black Pepper)

তুমি গোলমরিচ বা কালোমরিচ নিশ্চয়ই দেখেছ। নীচের সারণিটি পূরণ করো।

গোলমরিচ কেমন দেখতে	তোমার বাড়িতে কী কাজে লাগে

গোলমরিচ একটি বহুবর্ষজীবী লতাজাতীয় উদ্ভিদ। অন্যান্য গাছে ভর করে এটি বেড়ে ওঠে । ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ আর পেকে গেলে লালচে রঙের হয়। শুকিয়ে গেলে পাকা ফলের রং কালো হয়ে যায়। সেটাই মশলা হিসেবে খাওয়া হয়।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

গোলমরিচের তীক্ষ্ণ স্বাদের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। এই কারণেই হিন্দিভাষী মানুষরা একে তীখে বলেন। যাঁরা রান্নায় লঙ্কা খেতে চান না, তাঁরা রান্নায় ঝাল স্বাদ আনতে গোলমরিচ ব্যবহার করেন। গোলমরিচ গোটা অবস্থায় বা গুঁড়ো করে রান্নায় ব্যবহার করা হয়। তীক্ষ্ম স্বাদের জন্য দায়ী পিপেরাইন নামে একটা যৌগের উপস্থিতি। তোমার বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে কোন কোন রান্নায় গোলমরিচ ব্যবহার করা হয় সেটা নীচের সারণিতে লিখে ফেলো।

বাড়িতে রান্না করা খাবারে	বাইরের খাবারে

অন্যান্য ব্যবহার

কাশি, দাঁতের ব্যথা, মাড়ি থেকে রক্ত পড়ায়, মাড়ির ব্যথায়, ডায়ারিয়া, বদহজম ও গ্যাসের সমস্যায় গোলমরিচ কাজে লাগে। মাংস এবং অন্যান্য খাবার যা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় — এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে গোলমরিচ সংরক্ষকের কাজ করে।

দারচিনি (Cinnamon)

দারচিনি দেখেছ? কেমন দেখতে বলতে পারো কিনা দেখোতো। আর বাড়িতে কী কাজে লাগে সেটাও লেখার চেষ্টা করো।

কেমন দেখতে	বাড়িতে কী কাজে লাগে

এটা একটা চিরহরিৎ উদ্ভিদ । দারচিনি গাছের কাণ্ডের ছালের ভেতরের স্তর (inner bark) শুকিয়ে তৈরি হয় দারচিনি। এই ছালের ধরনের ওপর নির্ভর করে দু-ধরনের দারচিনি পাওয়া যায়—মোটা ছাল আর পাতলা ছালের দারচিনি।

রান্নার কাজে ব্যবহার

দারচিনির নিজস্ব একটা সুগন্ধ আর স্বাদ আছে। তাই দারচিনি ছোটো ছোটো টুকরো করে বা গুঁড়ো করে নানারকম রান্নায় ব্যবহার করা হয়।

তুমি কোন কোন রান্নায় দারচিনি ব্যবহার হতে দেখেছ, লিখে ফেলো দেখি।

কোন কোন রান্নায় দারচিনি ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

ডায়ারিয়া, বমিভাব, বমি, সর্দিতে দারচিনি থেকে উপকার পাওয়া যায়। দারচিনি থেকে যে উদ্‌বায়ী তেল পাওয়া যায়, সেটা বাতের ব্যথায় মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে দারচিনিকে এক অমূল্য মশলা বলে মনে করা হতো। ঐতিহাসিক প্লিনি লিখেছিলেন যে 327 গ্রাম (তখনকার এক রোমান পাউন্ড) দারচিনির দাম ছিল এক শ্রমিকের প্রায় দশ মাসের পারিশ্রমিকের সমান।

হলুদ (Turmeric)

তোমরা প্রত্যেকেই হলুদের সঙ্গে পরিচিত। নীচে সারণিতে লিখে ফেলো হলুদ কেমন দেখতে আর কী কী কাজে হলুদ ব্যবহার হতে তুমি দেখেছ।

গাছ	কেমন দেখতে	কী কাজে লাগে

হলুদ একটা বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। হলুদের বায়বীয় কাণ্ড প্রায় নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তার প্রায় সবটাই পাতা দিয়ে ঢাকা। মাটির নীচে কাণ্ডের একটি অংশ, কন্দ থাকে।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

মাটির নীচে হলুদ গাছের হলুদ রঙের যে কন্দ পাওয়া যায় সেখান থেকেই বাণিজ্যিক হলুদ অর্থাৎ মশলার হলুদ তৈরি হয়। কন্দগুলোকে প্রায় 30-45 মিনিট জলে ফোটানো হয়। এরপর গরম ওভেনে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর এই শুকনো কন্দগুলোকে গুঁড়ো করা হয়।

বিভিন্ন সবজি, মাছ বা মাংস রান্নায় হলুদ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মাখন, চিজ, মার্জারিন, আচার আর সরষের স্বাদ ও রং আনতে হলুদ ব্যবহার করা হয়।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্নায় হলুদ ব্যবহার করা হয় লিখে ফেলো।

বাড়িতে কোন কোন রান্নায় হলুদ ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

হলুদে কারকিউমিন (Curcumin) নামের একটা যৌগ পাওয়া যায়। এই যৌগের উপস্থিতির জন্যই জীবাণুনাশক হিসাবে হলুদ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাককে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে। হলুদ যকৃতকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, অ্যালার্জি, আলজাইমার রোগের চিকিৎসাতে কারকিউমিন কার্যকরী। শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগলে বা মচকে গেলে চুন-হলুদ লাগালে উপকার পাওয়া যায়। হলুদে লোহার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি রক্তাল্পতায় ভালো কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলুদ সক্ষম। ওষুধ আর বিভিন্ন খাবারে রং আনবার জন্যও হলুদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এলাচ (Cardamom)

এলাচ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। এলাচ কেমন দেখতে হয় বলোতো? আর কী কাজেই বা লাগে এলাচ? নীচের পৃষ্ঠার সারণিতে লিখে ফেলো।

কেমন দেখতে	কী কী কাজে লাগে

এলাচ হলো একরকমের বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। এর কাণ্ড থাকে মাটির নীচে। এলাচ প্রধানত দু-রকমের—বড়ো এলাচ আর ছোটো এলাচ। বড়ো এলাচ শুকোলে তামাটে রঙের হয়। এই ফলটাই এলাচ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর ছোটো এলাচের ফলটা কৃত্রিমভাবে তাপে শুকোলে হালকা বাদামি রঙের হয়। গাছ থেকে তোলার সময় কেবলমাত্র এলাচের সেই ফলগুলোকেই বেছে নেওয়া হয় যেগুলো প্রায় পেকে উঠেছে। পুরোপুরি পাকা ফল নেওয়া হয় না। কারণ পাকা ফল শুকোনোর সময় ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বড়ো এলাচ

ছোটো এলাচ

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

নানারকম তরকারিতে স্বাদ আর গন্ধ আনতে এলাচ ব্যবহার করা হয়। পায়েস আর অন্যান্য মিষ্টি খাবারেও এলাচের ব্যবহার আছে।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্না করা খাবারে এলাচ ব্যবহার করা হয় নীচের সারণিতে লেখো।

কোন কোন রান্না করা খাবারে এলাচ ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

গ্যাস বা পাকস্থলী সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় এলাচের ব্যবহার আছে। পানের মধ্যে এলাচ দিয়ে খাওয়া হয়। খাওয়ার পরে মুখশুদ্ধি হিসেবেও খাওয়া হয়। বড়ো এলাচ দাঁতের মাড়ি সবল করে। বড়ো এলাচের দানা ভেঙে খেলে বমিভাব কমে যায়।

গরমমশলা

লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, গোলমরিচ, জৈত্রী আর জায়ফল একসঙ্গে মিশিয়ে গরমমশলা তৈরি করা হয়। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গরমমশলা তৈরির উপাদান অর্থাৎ মশলার পার্থক্য থাকে। নানারকম তরকারি, মাছ, মাংস ইত্যাদি রান্নায় স্বাদ আর গন্ধ আনতে গরমমশলা ব্যবহার করা হয়।

আদা (Ginger)

আদা কেমন দেখতে আর কী কাজে লাগে নীচের সারণিতে লেখো।

কেমন দেখতে	কী কী কাজে লাগে

আদা একটা বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড গ্রন্থিকাণ্ড প্রকৃতির, মাটির নীচে থাকে। আদা গাছের গ্রন্থিকাণ্ডটাই শুকিয়ে নিয়ে আদা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

বিভিন্ন রান্নায় পিঁয়াজ, রসুনের সঙ্গে আদা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কোনো কোনো পাঁউরুটি তৈরিতে আর বেকারিশিল্পেও আদার ব্যবহার আছে। সস তৈরিতেও আদা ব্যবহার করা হয়।

তোমার বাড়িতে আদা কোন কোন রান্নায় ব্যবহার করা হয় নীচে লেখো।

কোন কোন রান্নায় আদা ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

পেটের অসুখ, অম্বল বা গ্যাসের সমস্যায়, কাশি ও হাঁপানিতে আদা কার্যকরী। খাওয়ার আগে বিশেষত বর্ষাকালে আর শীতকালে আদার কুচি নুন দিয়ে খেলে (আদা-নুন) মুখে খাওয়ার রুচি আসে, খিদে বাড়ে। আসলে আদা খেলে মুখে লালা তৈরি হয়। আর তোমরা তো জানো যে, লালারস খাবার হজম করতে সাহায্য করে।

রসুন (Garlic)

রসুন কেমন দেখতে আর কী কী কাজে লাগে নীচের সারণিতে লিখে ফেলো।

কেমন দেখতে	কী কী কাজে লাগে

এটা একটা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

পিঁয়াজের মতো এরও কাণ্ড কন্দ জাতীয়। মাটির নীচে লম্বভাবে অবস্থান করে। রসুনের কন্দ 6-30 টা আরো ছোটো ছোটো কন্দের মতো অংশ নিয়ে তৈরি। এগুলো হলো রসুনের এক একটা কোয়া। এই গোটা অংশটা একটা সাদা বা হালকা গোলাপি কাগজের মতো খোসা দিয়ে ঢাকা থাকে।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

রসুন গাছের কন্দটাই রসুন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাছমাংসসহ বিভিন্ন রান্নায় স্বাদ আনতে রসুন ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো পাঁউরুটি (গার্লিক ব্রেড) তৈরিতে রসুনের ব্যবহার আছে।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্নায় রসুন ব্যবহার করা হয় নীচে লেখো।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্নায় রসুন ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

রসুনে থাকে অ্যালিসিন নামে এক যৌগ। এই যৌগের জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে। রসুন গ্যাস দূর করে। তাছাড়াও পাকস্থলীকে উদ্দীপিত করে খাবার হজম করতে সাহায্য করে। হৃৎপিন্ড ও রক্তনালীর নানা সমস্যায় রসুন কার্যকরী। রসুনের অ্যান্টিসেপটিক বা পচননিবারক ভূমিকাও আছে।

তোমার বাড়িতে নিশ্চয়ই আরো কিছু মশলা ব্যবহার করা হয়। নীচের সারণিতে তাদের নাম আর ব্যবহার লেখো।

মশলার নাম	ব্যবহার

ওষধি গাছ

আমাদের দেশে ওষুধ হিসেবে বিভিন্ন দেশীয় গাছ বা গাছের অংশ ব্যবহারের চল দীর্ঘদিনের। অথর্ববেদে বিভিন্ন গাছগাছড়ার ওষধি গুণের কথা বলা আছে। বেদ-পরবর্তী যুগে সুশ্রুতের লেখা সুশ্রুত-সংহিতায় প্রায় 700 ওষুধের কথা আছে। পরবর্তীকালে ওষধি গুণাগুণসম্পন্ন আরও অনেক গাছের কথা জানা গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতো পৃথিবীর প্রায় 80% মানুষ তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নির্ভর করেন চিরাচরিত ওষুধের ওপর। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট 20,000-এরও বেশি এমন গাছের কথা জানা গেছে, যাদের ওষধি গুণাগুণ আছে। তার মধ্যে এশিয়াতেই পাওয়া যায় প্রায় 8500 প্রজাতির গাছ। আমাদের দেশেই বর্তমানে প্রায় 3500 প্রজাতির ওষধি গাছের কথা জানা গেছে। এখানে আমাদের দেশে পাওয়া যায় এমন কয়েকটা ওষধি গাছ আর তাদের গুণাগুণের কথা আমরা আলোচনা করব।

নিম

নিম একটা মাঝারি ধরনের বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এই চিরহরিৎ উদ্ভিদ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।

তোমার অঞ্চলে নিমগাছের বিভিন্ন অংশ কীভাবে ব্যবহার করা হয় পরের পৃষ্ঠার সারণিতে লেখো।

গাছের অংশ	কী কাজে ব্যবহার করা হয়
(i) কাণ্ড (ii) পাতা (iii)	

ওষধি গুণ

(i) বহুমূত্র রোগের ক্ষেত্রে নিমপাতার রস খুবই উপকারী।

(ii) ভাইরাসজনিত মহামারি আর বাতে নিম বীজ কাজে লাগে।

(iii) কানের ব্যথায়, দাঁত আর দাঁতের মাড়ির ব্যথায় নিমতেল ব্যবহার করা হয়।

(iv) নিম গাছের মূল বা কাণ্ডের ছাল (বাকল) আর পাতা থেকে তেঁতো স্বাদের যে ওষুধ তৈরি হয়, সেটি বারে বারে ফিরে আসা জ্বর (যেমন — ম্যালেরিয়া) সারাতে কাজে লাগে। নানারকম চর্মরোগ সারাতেও এটি ব্যবহার করা হয়।

(v) বর্তমানে বহু প্রসাধনী জিনিসে (সাবান, শ্যাম্পু, দাঁতের মাজন, পাউডার) নিমজাত পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

(vi) কীটনাশক ওষুধ হিসাবেও নিমতেলের ব্যবহার আছে।

(vii) নিমগাছের পাতা আর মূলের অ্যান্টিবায়োটিক অর্থাৎ জীবাণুনাশক ক্ষমতা স্বীকৃত।

(viii) নিমের তেল চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে, যকৃতের কাজ করার ক্ষমতা বাড়াতে, রক্তকে পরিষ্কার রাখতে ব্যবহার করা হয়।

(ix) এছাড়া নিমজাত দ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক আর পরজীবী কৃমি প্রতিরোধী গুণ আছে।

কচি ডালশুদ্ধ নিমপাতা জোগাড় করো। খবরের কাগজের মাঝে কয়েকদিন রেখে শুকিয়ে নিয়ে খাতায় আটকাও।

বেল

এটি একটি মাঝারি আকারের পর্ণমোচী উদ্ভিদ।

তোমার এলাকায় বেল বা বেলগাছের অংশ কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় লেখো।

ওষধি গুণ

(i) বেলে থাকে মিউসিলেজ আর পেকটিন যা কোষ্ঠকাঠিন্যের অব্যর্থ ওষুধ।

(ii) বেলের শরবত আমাশয় রোগীদের অন্ত্রের যত্ন নেয়।

(iii) কাঁচা বা আধ-কাঁচা ফল খিদে ও হজমক্ষমতা বাড়ায়।

(iv) দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখে বেল কার্যকরী।

(v) বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষায় বেলের পাতা, ফল আর মূলের অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণু-প্রতিরোধী ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে জ্বর হলে বেলগাছের মূলের ছাল থেকে তৈরি ওষুধ খাওয়ার চল আছে।

আমলকী

আমলকী একটা মাঝারি ধরনের পর্ণমোচী বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ।

আমলকী ফল নিশ্চয়ই দেখেছ। কেমন দেখতে আর কী কী কাজে লাগে লেখো।

আমলকী ফল কেমন দেখতে	আমলকী ফল কী কাজে লাগে

ওষধি গুণ

(i) আমলকী ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C আছে। দাঁতের মাড়ি ফোলায় আমলকী ফল খুব কাজে আসে।

(ii) শুকনো আমলকী ফল পেটের গোলমাল, রক্তক্ষরণ আর আমাশয় বন্ধ করতে সক্ষম।

(iii) বমিভাব আর কোষ্ঠকাঠিন্যেও ভালো কাজ করে আমলকী।

(iv) আমলকী ফলের বীজ হাঁপানি, পিত্তরোগ আর ফুসফুসের প্রদাহে উপকারী।

(v) অ্যানিমিয়া, বার্ধক্য ও ক্যান্সার প্রতিরোধে আমলকী ফল কার্যকরী।

তোমার এলাকায় আমলকী ফল আর কী কী ভাবে ব্যবহার করা হয় লেখার চেষ্টা করো।

ত্রিফলা : ত্রিফলা হলো একধরনের আয়ুর্বেদিক ওষুধ। 'ত্রিফলা' কথাটার মানে তিনটে ফল। ত্রিফলায় থাকে সমপরিমাণে আমলকী, হরিতকি আর বহেড়া (বীজ ছাড়া)। ত্রিফলাচূর্ণ জোলাপের কাজ করে, যা আমাদের শরীরের পরিপাকনালীকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। ত্রিফলা রক্ত-পরিষ্কারক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ত্রিফলায় খুব বেশি পরিমাণে ভিটামিন C থাকে। তাই ত্রিফলাকে অনেকসময় সহযোগী খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

নয়নতারা

নয়নতারা একবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ।

ওষধি গুণ

(i) নয়নতারা পাতা বহুমূত্র রোগের একটা ভালো ওষুধ।

(ii) মূত্র বৃদ্ধিকারক, আমাশয় প্রতিরোধক, রক্তক্ষরণ প্রতিরোধক গুণ আছে নয়নতারার।

(iii) রক্তার্শে আর বোলতার কামড়ে নয়নতারা পাতা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

(iv) এই গাছের মূলে থাকে রৌবেসিন (Raubasine) নামে একটি উপক্ষার। মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালনে কোনোরকম বাধার সৃষ্টি হলে এই উপক্ষার তা দূর করতে সাহায্য করে।

(v) ভিনক্রিস্টিন (Vincristine) আর ভিনব্লাস্টিন (Vinblastine) নামের অন্য দুটো উপক্ষারও পাওয়া যায়

নয়নতারায়। ব্লাড ক্যানসার আর অন্যান্য কয়েক ধরনের ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের জন্য বর্তমানে চিকিৎসাজগতে এই দুটি উপক্ষার ব্যবহার করা হচ্ছে। রক্তের ক্যানসার ছাড়াও টিউমার প্রশমনেও এই দুটি উপক্ষার বেশ কার্যকরী।

পুদিনা

পুদিনা একটা বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ।

ওষধি গুণ

(i) পুদিনার শরবত পেটের গোলমালে খুব উপকারী। এছাড়াও মূত্রের পরিমাণ বাড়াতে, বমিভাব দূর করতে পুদিনা সাহায্য করে।

(ii) পেট ফাঁপা, বদহজম, বাচ্চাদের পাতলা পায়খানা আর মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে পুদিনা কার্যকরী।

(iii) পুদিনা জীবাণুনাশক হিসাবেও কাজ করে।

(iv) কাশি, অরুচি ও পাকস্থলীর প্রদাহে পুদিনা উপকারী।

(v) পুদিনার প্রলেপ ব্যথার জায়গায় লাগালে বাতের যন্ত্রণা ও মাথাধরা কমাতে সাহায্য করে।

ঘৃতকুমারী

ঘৃতকুমারী হলো বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ।

ওষধি গুণ

(i) ভিটামিন, খনিজ মৌল, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিড ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাসে পাওয়া যায়।

(ii) অ্যাসিডের আধিক্য, রক্তের ঘন হয়ে যাওয়ার প্রবণতা, দূষণজনিত চাপ ও অস্থিসন্ধির প্রদাহ কমাতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

(iii) গ্যাস্ট্রিক ক্ষত, কোষ্ঠকাঠিন্য, তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত চামড়ার ক্ষতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

(iv) ঘৃতকুমারীর নির্যাসে অ্যান্টিপাইরেটিক উপাদান থাকায় জ্বর হলে তাপমাত্রা কমাতে এটি ব্যবহৃত হয়।

(v) ঘৃতকুমারীর পাতার নির্যাসে প্রায় 99% জল থাকে। তাই চামড়াকে আর্দ্র করতে, স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে এই নির্যাস ব্যবহার করা হয়। এই নির্যাস ব্যবহার করলে চামড়ায় রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ত্বকের কলাকোশের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ও সংশ্লেষ -ক্ষমতা বাড়ে। ফলে ত্বক শিথিল হয় না।

(vi) মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগ কমাতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পাঠ্যসূচি

1.1 বল ও চাপ
- ক) বলের পরিমাপ ও একক
- খ) ঘর্ষণ ও তার পরিমাপ
- গ) তরলের ঘনত্ব ও চাপ
- ঘ) তরলের চাপ
- ঙ) বায়ুর চাপ
- চ) বস্তুর ভাসন, প্লবতা ও আর্কিমিদিসের নীতি

1.2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল
- ক) অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ
- খ) অভিকর্ষ ও মহাকর্ষের প্রভাবে গতি
- গ) স্থির তড়িৎ বল ও আধানের ধারণা
- ঘ) তড়িৎ বলের প্রভাবে গতি

1.3 তাপ
- ক) তাপের পরিমাপ ও একক
- খ) অবস্থার পরিবর্তন ও লীনতাপের ধারণা
- গ) তাপের প্রবাহ পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ

1.4 আলো
- ক) প্রতিবিম্ব
- খ) আলোর প্রতিসরণের সূত্র

2.1. পদার্থের প্রকৃতি
- ক) পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম
- খ) ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
- গ) মানবজীবনে ও পরিবেশে ধাতু ও অধাতুর ব্যবহার

2.2. পদার্থের গঠন
- ক) পরমাণু ও অণুর ধারণা
- খ) পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা
- গ) যোজ্যতা ও রাসায়নিক বন্ধন

2.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া
- ক) রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবক
- খ) অনুঘটক
- গ) তাপগ্রাহী ও তাপমোচী পরিবর্তন
- ঘ) জারণ বিজারণের ধারণা

2.4. তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব
তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎলেপন

3. কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি
- ক) পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি
- খ) অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন

4. প্রকৃতিতে ও জীবজগতে বিভিন্নরূপে কার্বন যৌগের অবস্থান
- ক) প্রকৃতিতে ও জীবজগতে কার্বন যৌগের অবস্থান
- খ) বহুরূপতা
- গ) জ্বালানি মূল্য বা ক্যালোরি মূল্য
- ঘ) কার্বন ডাইঅক্সাইড
- ঙ) গ্রিনহাউস এফেক্ট
- চ) কার্বনঘটিত পলিমার ও তার ব্যবহার

5. প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ
- ক) বজ্রপাত
- খ) মহামারি

6. জীবদেহের গঠন
- ক) জীবদেহ গঠনের ধাপসমূহ
- খ) মাইক্রোস্কোপ
- গ) কোশের বৈচিত্র্য
- ঘ) বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্য ও কোশীয় বিশেষত্ব
- ঙ) প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও কোশীয় অঙ্গাণু
- চ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কোশের ওপর প্রভাব

7. অণুজীবের জগৎ
- ক) অণুজীবের বৈচিত্র্য
- খ) জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক (পরজীবী, মিথোজীবী ও মৃতজীবী)
- গ) পরিবেশে অণুজীবের ভূমিকা (কৃষি,খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি, বর্জ্য পরিষ্কার)

8. মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন
- ক) ফসল, ফসলের বৈচিত্র্য ও ফসল উৎপাদন
- খ) উদ্ভিদজাত খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি
- গ) প্রাণীজ খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

9. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি
- ক) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি
- খ) বয়ঃসন্ধি

10. জীববৈচিত্র্য, পরিবেশের সংকট ও বিপন্ন প্রাণী সংরক্ষণ
- ক) বন
- খ) সমুদ্রের নীচের জীবন
- গ) মরু অঞ্চলের জীবজগৎ
- ঘ) মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ
- ঙ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ
- চ) কয়েকটি বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও তাদের সংরক্ষণ

11. আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদজগৎ
- ক) পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাছ
- খ) মশলা ও গাছ
- গ) ওষধি গাছ

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1.	ভৌত পরিবেশ— 1.1 বল ও চাপ (1-16)	5
	1.2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল (17-28)	
2.	মৌল, যৌগ ও—2.1 পদার্থের প্রকৃতি (54-78)	5
	—2.2 পদার্থের গঠন (79-91)	
3.	দেহের গঠন — (173-190)	5

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1.	ভৌত পরিবেশ—1.3 তাপ	5
2.	মৌল, যৌগ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া—2.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া (92-109)	5
	—2.4 তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব (110-117)	5
5.	প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ (160-172)	5
8.	মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন (202-223)	5

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন :

1.	ভৌত পরিবেশ 1.4 আলো (46-53)	7
3.	কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি (118-133)	7
4.	কার্বন ও কার্বনঘটিত যৌগ (134-159)	7
7.	অণুজীবের জগৎ (191-201)	7
9.	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি (224-242)	7
10.	পরিবেশের সংকট ও সংরক্ষণ (243-279)	7
11.	আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদ জগৎ (280-293)	7

বিশেষ মন্তব্য : তৃতীয় পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অংশগুলির সঙ্গে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত বল ও চাপ; পদার্থের গঠন ও দেহের গঠন অধ্যায়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে। সংযোজিত অংশটি ধরে প্রতিটি বিষয় অবলম্বনে 7 নম্বরের প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের জন্য তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধ্যায় ও তা থেকে তৈরি করা প্রশ্নের মূল্যায়নের সারণিটি হবে নিম্নরূপ :

অধ্যায়	প্রশ্নের মূল্যমান
1.1. বল ও চাপ	7
1.4. আলো	7
2.2 পদার্থের গঠন	7
3. কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি	7
4. কার্বন ও কার্বনঘটিত যৌগ	7
6. দেহের গঠন	7
7. অণুজীবের জগৎ	7
9. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি	7
10. পরিবেশের সংকট ও সংরক্ষণ	7
11. আমাদের চারপাশের পরিবেশের ও উদ্ভিদ জগৎ	7

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
1) সারণি পূরণ 2) ছবি বিশ্লেষণ 3) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ 4) দলগত কাজ ও আলোচনা 5) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ 6) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন 7) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি 8) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	i) অংশগ্রহণ ii) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান iii) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য iv) সমানুভূতি ও সহযোগিতা v) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।)

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) তরলের চাপ ক্রিয়া করে — a) শুধু নীচের দিকে b) শুধু পাশের দিকে c) শুধু উপরের দিকে d) সবদিকে সমানভাবে।

ii) একটা ছোটো বস্তুকে কিছুটা উপর থেকে ফেলে দিলে। বস্তুটা নীচের দিকে পড়বে। তাহলে — a) বস্তু পৃথিবীকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে b) পৃথিবী বস্তুকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে c) বস্তু ও পৃথিবী দুজনেই দুজনকে সমান বলে আকর্ষণ করবে d) উপরের কোনোটাই ঠিক নয়।

iii) সিসা ও টিন মিশিয়ে ফিউজ তার তৈরি করা হয় কারণ তাতে — a) পরিবাহী তারের রোধ কমে b) পরিবাহী তারের গলনাঙ্ক সিসা ও টিন উভয়ের গলনাঙ্কের চেয়ে কমে c) পরিবাহী তার আরও শক্ত হয় d) সিসা ও টিন সহজে পাওয়া যায়।

iv) দুটি আয়নাকে এমনভাবে রাখা হলো যাতে তাদের মধ্যবর্তী কোণ হয় 60^0। আয়না দুটির মাঝখানে একটি বস্তু রাখলে মোট প্রতিবিম্বের সংখ্যা হবে — a) 3টে b) 4টে c) 5টা d) 6টা।

v) টেবিলের ওপর একটি বই স্থির অবস্থায় রয়েছে। বইটি স্থির থাকার কারণ — a) বইটির ওপর কোনো বল কাজ করছে না। b) বইটির ওজন ও টেবিলের লম্ব প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমমানের ও পরস্পরের বিপরীতমুখী। c) বইটির তলদেশে টেবিলের দেওয়া কোনো ঘর্ষণ বল কাজ না করার জন্য। d) বস্তুর ওজন টেবিলের লম্ব প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি।

vi) যদি বায়ুতে কোনো বস্তুর ওজন W_1 ও তরলে নিমজ্জিত হলে তার ওপর ক্রিয়াশীল প্লবতা W_2 হয়, নীচের কোনটি ভাসনের শর্ত?— a) $W_1 > W_2$ b) $W_1 = W_2$ c) $W_1 < W_2$ iv) $W_1 \neq W_2$ হলেই চলবে।

vii) একটা ক্যাম্বিস বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীর টানে নীচের দিকে নেমে আসে। কিন্তু পৃথিবী ও বস্তু পরস্পরকে সমান বলেই আকর্ষণ করে। তাহলে ক্যাম্বিস বলই কেন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, উলটো হয় না কেন? — a) কারণ ক্যাম্বিস বলটির টানে পৃথিবীতে সৃষ্ট ত্বরণ। পৃথিবীর টানে ক্যাম্বিস বলটিতে সৃষ্ট ত্বরণের চেয়ে বেশি। b) কারণ পৃথিবীর টানে বস্তুতে সৃষ্ট ত্বরণ, ক্যাম্বিস বলটির টানে পৃথিবীতে সৃষ্ট ত্বরণের চেয়ে বেশি c) কারণ উল্লেখিত উভয় ত্বরণই সমমানের d) ক্যাম্বিস বলটির টানে পৃথিবীতে কোনো ত্বরণ সৃষ্টি হয় না।

viii) একটা টেস্টটিউবে জিঙ্ক ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় একটা বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হলো যা শব্দসহ নীল শিখায় জ্বলে উঠে নিভে যায়। গ্যাসটা হলো— (a) অক্সিজেন (b) নাইট্রোজেন (c) কার্বন ডাইঅক্সাইড (d) হাইড্রোজেন

ix) জলের মধ্যে পোড়াচুন দিলে প্রচুর স্টিম উৎপন্ন হয় কারণ— (a) পোড়াচুন খুব গরম পদার্থ (b) পোড়াচুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া তাপগ্রাহী বিক্রিয়া (c) পোড়াচুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া তাপমোচী বিক্রিয়া (d) এদের কোনোটিই নয়।

x) নীচের কোনটি তড়িৎবিশ্লেষ্য— (a) চিনি (b) অ্যালকোহল (c) গ্লুকোজ (d) নুন

xi) নীচের কোন্ অক্সাইডটি উভধর্মী — (a) কার্বন ডাইঅক্সাইড (b) ক্যালশিয়াম অক্সাইড (c) সালফার ডাইঅক্সাইড (d) জিঙ্ক অক্সাইড

xii) কোন্‌টি অক্সিজেনের বৃহৎ শিল্পব্যবহার— (a) অ্যামোনিয়া তৈরি (b) ইউরিয়া তৈরি (c) সোডা তৈরি (d) ইস্পাত তৈরি

xiii) ডেঙ্গি রোগের জীবাণু বহন করে যে প্রাণী সেটি হলো— (a) অ্যানোফিলিস মশা (b) কিউলেক্স মশা (c) এডিস মশা (d) মাছি

xiv) DOTS পদ্ধতিতে যে রোগের চিকিৎসা করা হয় সেটি হলো — (a) কালাজ্বর (b) স্মল পক্স (c) হেপাটাইটিস (d) যক্ষ্মা

xv) গলজি বস্তু সৃষ্টি হয় যে অঙ্গাণু থেকে সেটি হলো —(a) এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা (b) রাইবোজোম (c) কোশপর্দা (d) লাইসোজোম

xvi) প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে— (a) গলজি বস্তু (b) সাইটোপ্লাজম (c) লাইসোজোম (d) রাইবোজোম

xvii) জিয়ার্ডিয়াসিস রোগটি হলো — (a) ব্যাকটেরিয়াঘটিত (b) ছত্রাকঘটিত (c) ভাইরাসঘটিত (d) আদ্যপ্রাণীঘটিত

xviii) খারিফ ফসলের একটি উদাহরণ হলো— (a) গম (b) ভুট্টা (c) ছোলা (d) সরষে

xix) কৃত্রিম পদ্ধতিতে মাছের ডিমপোনা তৈরি করতে যে গ্রন্থির নির্যাস ব্যবহার করা হয় সেটি হলো— (a) অগ্ন্যাশয় (b) পিট্যুইটারি (c) শুক্রাশয় (d) থাইরয়েড

x) ইনসুলিন ক্ষরিত হয় যে গ্রন্থি থেকে সেটি হলো — (a) অগ্ন্যাশয় (b) থাইরয়েড (c) অ্যাড্রিনাল (d) পিট্যুইটারি

xi) নালিপদের সাহায্যে চলাফেরা করে এমন একটি প্রাণী হলো — (a) হাঙর (b) সাগরকলম (c) তারামাছ (d) অক্টোপাস

xii) সুন্দরবন হলো একটি— (a) অভয়ারণ্য (b) ন্যাশনাল পার্ক (c) সংরক্ষিত বন (d) বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

xiii) কারকিউমিন যৌগটি পাওয়া যায় যে মশলায় সেটি হলো — (a) দারচিনি (b) হলুদ (c) রসুন (d) আদা

xiv) আদ্যপ্রাণীর দেহে কোষের সংখ্যা— (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

xv) আমেরিকার মরু অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানরা পাথরের তৈরি যে বাড়িতে থাকে তার নাম —(a) ইগলু (b) পুয়েবলা (c) তাঁবু (d) ঝুপড়ি

2. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে 'x' দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) ম্যালেরিয়া কথাটির অর্থ হলো খারাপ বায়ু। ☐ ii) যক্ষ্মা বায়ুবাহিত মারণরোগ। ☐ iii) মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপর্দা ভাঁজ হয়ে ক্রিস্টি গঠন করে। ☐ iv) খুব শুকনো ও ঠান্ডা পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের কোষে অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে। ☐ v) থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া (100^0C) তাপমাত্রার কাছাকাছি তাপমাত্রায় বংশবৃদ্ধি করে। ☐ vi)ক্লোরোমাইসেটিন হলো একধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। ☐ vii) অজৈব সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। ☐ viii) আউস ধান জমিতে একেবারে সরাসরি বোনা হয়। ☐ ix) মাইনর কার্পের উদাহরণ হল মৃগেল। ☐ x) মেয়েদের শরীরে থাকা জনন গ্রন্থির নাম হলো শুক্রাশয়। ☐ xi) আত্মসচেতনতা হল জীবনকুশলতা চর্চার একটি অন্যতম দিক। ☐ xii) কেল্প হলো খুব বড়ো সামুদ্রিক শ্যাওলা। ☐ xiii) মরুভূমির মেশকুইট গাছে পাতা থাকে না। ☐ xiv) গন্ডারের খড়্গ তৈরি হয় কেরাটিন দিয়ে। ☐ xv) হলুদ একটা চিরহরিৎ উদ্ভিদ। ☐ xvi) আমলকী ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C আছে। ☐

3. শূন্যস্থান পূরণ করো : (প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য 1 নম্বর)

i) একটি চোঙাকৃতির ড্রামের তলদেশে ড্রামটিতে অবস্থিত জলের চাপ _____ হয়ে যাবে যদি ড্রামের জল অর্ধেক বের করে নেওয়া হয়। ii) জলে ভাসমান অবস্থায় একটি বস্তুর ওজন 12N। তাহলে ঊর্ধ্বমুখী প্লবতা_____N । iii) অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর _____ নিরপেক্ষ। iv) কোন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বার করে নিলে তা _____ হয়ে পড়বে। v) তুমি আয়নার দিকে 3 m সরে এলে তোমার প্রতিবিম্ব তোমার দিকে _____ m সরে আসবে। vi) পেরিস্কোপে আলোর _____ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। vii) দুটি মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক সমান হলে আপতিত ও প্রতিসৃত রশ্মির মধ্যে কোণের মান হবে _____। viii) বিশুদ্ধ বরফ অপেক্ষা নুন মেশানো বরফের গলনাঙ্ক_____। ix) শীতকালে একটা মোটা জামার চেয়ে দুটি পাতলা জামা পরলে শরীর বেশি _____ থাকে। x) ইগলু বরফ দিয়ে বানানো হয় কারণ বরফ তাপের_____। xi) মরীচিকা_____প্রতিবিম্বের উদাহরণ। xii) সাধারণত: ধাতুর তাপ পরিবাহিতা অধাতুর চেয়ে _____ যদিও _____ এবং _____ অধাতু দুটো এই বিবৃতির ব্যতিক্রম: xiii) সোনার প্রসারণশীলতা লোহার চেয়ে _____ বলেই সোনার সূক্ষ্ম তার তৈরি করা সম্ভব হয়; xiv)

মৌল অণুর কল্পনা করেন _____ । xv) প্রাচীন গ্রিসে _____ ও _____ পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন xvi) $^{206}_{82}Pb$ পরমাণুতে প্রোটন , ইলেকট্রন ও নিউট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে _____ , _____ , ও _____ । xvii) $^{14}_{7}N$ ও $^{14}_{6}C$ পরস্পরের _____ । xviii) সূর্যালোকের _____ রশ্মিই প্রধানত তাপের অনুভূতি সৃষ্টি করে। xix) _____ অক্সাইড ধাতুর অক্সাইড হলেও উভধর্মী প্রকৃতির। xx) কঠিন বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ _____ । xxi) হাইড্রোজেনের সর্ববৃহৎ শিল্পব্যবহার হলো _____ তৈরি। xxii) জলের তড়িৎবিশ্লেষণে _____ ও _____ গ্যাস পাওয়া যায়। xxiii) $ZnO + C \rightarrow Zn + CO$ বিক্রিয়ায় _____ জারিত ও _____ বিজারিত হয়েছে। xxiv) ঘৃতকুমারীর নির্যাসে _____ উপাদান থাকায় জ্বর হলে তাপমাত্রা কমাতে ব্যবহার করা হয়। xxv) দারচিনি গাছের _____ থেকে পাওয়া যায়। xxvi) সুন্দরী হলো একধরনের _____ উদ্ভিদ। xxvii) ব্যথা কমানোর ওষুধ _____ শকুনের বৃক্ককে নষ্ট করে দেয়। xxviii) _____ মেরুতে পেঙ্গুইনদের দেখা যায়। xxix) তারামাছের বাহুর সংখ্যা _____ । xxx) টেস্টোস্টেরন _____ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। xxxi) গোল্ডেন রাইসে _____ ভিটামিনের পরিমাণ বেশি। xxxii) _____ ব্যাকটেরিয়া দই তৈরিতে সাহায্য করে। xxxiii) ক্ল্যামাইডোমোনাস হল এককোশী _____ । xxxiv) প্রাণীকোশের বিভাজনে অংশগ্রহণ করে _____ নামক অঙ্গাণু । xxxv) কালাজ্বরের আরেক নাম _____ জ্বর। xxxvi) _____ ব্যাকটেরিয়া বর্জ্যকে ভেঙে মিথেন গ্যাস তৈরি করে।

4. স্তম্ভগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো : **(প্রতিটি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 1নম্বর)**

(নমুনা হিসাবে একটি করে দেওয়া হলো)

I.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ	'C' স্তম্ভ
i) সংকট কোণ	a) পৃথিবীর টান	1) বিকিরণ
ii) সমসংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন	b) ঊর্ধ্বমুখী বল	2) মরীচিকা
iii) তাপের সঞ্চালন	c) অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন	3) অভিকর্ষ বল
iv) বস্তুর ওজন	d) গতির বিরুদ্ধে বাধা	4) পরমাণু নিস্তড়িৎ
v) প্রবাহীতে নিমজ্জিত বস্তু	e) মাধ্যম নিরপেক্ষ	5) ঘর্ষণ বল
vi) স্থির বস্তুতে গতি সৃষ্টির চেষ্টা	f) ইলেকট্রন ও প্রোটনের আধানের মান সমান কিন্তু বিপরীত প্রকৃতির	6) প্লবতা

উ: (b) - (iv) - (4)

II.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
i) আয়তন × ঘনত্ব	a) তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেশি হলে
ii) পতনশীল বস্তুর বেগ	b) সংকট কোণের মান কম
iii) বাষ্পায়ন দ্রুত হয়	c) সময় বাড়ার সঙ্গে বাড়ে
iv) হিরে চকচক করে	d) ভর

III.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
i) ক্যাথোডে	a) ইস্পাত তৈরিতে প্রয়োজন।
ii) অ্যানোডে	b) বিশেষ বিশেষ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি করে।
iii) কার্বন ডাইঅক্সাইড	c) মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য।

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
iv) অক্সিজেন	d) নন-বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার।
v) অ্যাসিটিক অ্যাসিড	e) বিজারণ ঘটে।
vi) পিভিসি	f) গ্রিনহাউস গ্যাস।
vii) সেলুলোজ	g) জারণ ঘটে।
viii) উৎসেচক বা এনজাইম	h) বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার।
ix) LPG	i) তরল জ্বালানি।
x) বায়োডিজেল	j) গ্যাসীয় জ্বালানি।

IV.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
i) সুন্দরী	a) ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত চিরসবুজ উদ্ভিদ
ii) মাইটোকন্ড্রিয়া	b) সমুদ্র ফেনা
iii) ইস্ট্রোজেন	c) 2,4-D
iv) আগাছানাশক	d) জোড়কলম
v) বাঁশ	e) শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া
vi) রাইজোবিয়াম	f) হরমোন
vii) গঙ্গার শুশুক	g) নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ
viii) গন্ডার	h) লবণাক্ত অঞ্চল
ix) কাটল ফিস	i) শাখাকলম
x) সিয়ন আর স্টক	j) ইকোলোকেশন
	k) জলদাপাড়া

5. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : **(প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1নম্বর)**

i) একটি বস্তু কোন তরলে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসছে। বস্তুর ওজন ও অপসারিত তরলের ওজনের মধ্যে সম্পর্ক কী? ii) দুটি ভিন্ন ভরের বস্তুকে অবাধে পড়তে দেওয়া হলো। ভারী বস্তুটি যদি 2 সেকেন্ড পরে মাটিতে পড়ে হালকা বস্তুটি কত সময় পরে মাটিতে পড়বে? iii) হুবহু একইরকম দুটি বোতলে একই পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন তরল রাখা আছে। বোতলসমেত একটির ভর 2 kg ও অপরটির ভর 2.5 kg। কোন তরলের ঘনত্ব বেশি? iv) জলপূর্ণ একটি ঢাকনা খোলা বোতলের গায়ে বোতলের তলদেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় দুটি ফুটো করা হলো। কোন ফুটো থেকে জল বেশি বেগে নির্গত হবে? ফুটো দুটি একই উচ্চতায় থাকলে কি একই ঘটনা ঘটত? v) জলের ওপর তেল ভাসে। তাহলে জল ও তেলের মধ্যে কার ঘনত্ব বেশি? vi) একটি কঠিন বস্তু ও একটি তরলের ঘনত্ব সমান। ওই কঠিন বস্তুটিকে ওই তরলে নিমজ্জিত করলে কী ঘটবে? vii) কোনো বস্তুকে 11.2 km/s বেগে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপর দিকে ছোড়া হলো। কী ঘটবে? viii) 10 N ও 20 N ওজনের দুটি বস্তুকে একই উচ্চতা থেকে একসঙ্গে অবাধে পড়তে দেওয়া হলো। কোনটি আগে মাটি স্পর্শ করবে? ix) হিমমিশ্রণ কোন নীতিতে কাজ করে? x) আলোর কোন ধর্মের জন্য সূর্য অস্ত চলে যাওয়ার পরেও সূর্যকে আমরা পশ্চিম আকাশে কিছুক্ষণ দেখতে পাই? xi) একটি 10 kg ভরের বস্তুর ওজন কত? ($g = 9.8 m/s^2$)। xii) পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো বস্তুর ওজন 25 N হলে তার ভর কত? xiii) কাচকে 'X' পদার্থ দিয়ে ঘষলে 'X' ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়। তাহলে এক্ষেত্রে কোন পদার্থটি ইলেকট্রন গ্রহণ ও কোনটি ইলেকট্রন বর্জন করেছে? xiv) কোনো কঠিনকে খোলা হাওয়ায় উত্তপ্ত করলে তরল অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে না এমন দুটো উদাহরণ দাও। xv) কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্ক উল্লেখ করার সময় চাপ উল্লেখ করা উচিত কেন? xvi) তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়ার দুটো ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো। xvii) হাইড্রোজেন সালফাইড ও কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের অণুর প্রাথমিক গঠন কেমন হবে এঁকে দেখাও। (কার্বনের যোজ্যতা 4, সালফারের যোজ্যতা 2; H ও Cl একযোজী)। xviii) গলিত $CaCl_2$ -র তড়িৎবিশ্লেষণে ক্যাথোড ও অ্যানোড সংঘটিত বিক্রিয়া দুটো লেখো। xix) লোহার পাইপে জিঙ্কের প্রলেপ দিতে হলে কোনটাকে ক্যাথোড ও

কোনটাকে অ্যানোডরূপে ব্যবহার করবে? xx) চারকোলের কোন ধর্মের জন্য জল, বিভিন্ন দ্রবণ ও গ্যাস পরিশোধন করতে ব্যাপকভাবে চারকোল ব্যবহৃত হয়? xxi) কার্বন ডাইঅক্সাইডের দুটো গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ব্যবহার উল্লেখ করো। xxii) একটা প্রকৃতিজাত বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার ও একটা কৃত্রিম, নন্-বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারের উদাহরণ দাও। xxiii) জৈব আবর্জনা থেকে জীবাণুর ক্রিয়ায় প্রস্তুত বায়োগ্যাসের মুখ্য উপাদান কী? xxiv) জৈব যৌগ গঠনে O, P, S, C —এই মৌলদের মধ্যে কোন্‌টা অপরিহার্য? xxv) শক্তির তিনটে বিকল্প উৎসের নাম লেখো। xxvi) জিঙ্ক ফসফেট, ক্যালশিয়াম নাইট্রেট, ফেরিক সালফেট ও মারকিউরাস নাইট্রেটের সংকেত লেখো। xxvii) একটা ধাতু ও একটা অধাতুর চিহ্ন লেখো যাদের যৌগ মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। xxviii) ইন-সিটু সংরক্ষণ কোথায় দেখা যায়? xxix) AIDS রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসের পুরো নামটা লেখো। xxx) ক্যাকটাসের কাণ্ডের কোশে জল সঞ্চয়ী উপাদানটির নাম লেখো। xxxi) কোন অণুজীব পাটকে জলে চুবিয়ে রাখলে পাটের কাণ্ডের পেকটিন নষ্ট করে দেয়? xxxii) আমন ধান চাষের জন্য কোন ধরনের মাটি উপযোগী? xxxiii) মুরগি পালনের একটি আধুনিক পদ্ধতির নাম লেখো। xxxiv) থাইরয়েড গ্রন্থি কোথায় থাকে? xxxv) একটি এককোশী ফাইটোপ্ল্যাংকটনের নাম লেখো। xxxvi) এস্কিমো শব্দের অর্থ কী? xxxvii) এমন একটি রোগের নাম লেখো যার জন্য ফ্ল্যাভিভাইরাস দায়ী। xxxviii) এলাচ ব্যবহার করা এমন একটা মিষ্টি খাবারের নাম লেখো। xxxix) রক্তে থাকা হয় এমন একটা কোশের নাম লেখো যেটা নিজের আকার পরিবর্তন করতে পারে।

6. দু-একটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 2 নম্বর)

i) দুটি বস্তু পরস্পর ঘষা হলো। বস্তুদুটি তড়িৎগ্রস্ত হলো— কেন এমন হলো? ii) কোন বস্তুর মোট ভরকে বস্তুটির মোট আয়তন দিয়ে ভাগ করা হলো। এতে বস্তুটির পরিমাপের কোন রাশি পাওয়া গেল? তা তুমি কীভাবে পেলে? iii) টেবিলের ওপর একটি ভারী বস্তু রাখা আছে। বস্তুটির ওপর তুমি ক্রমবর্ধমান বল প্রয়োগ করায় সেটি কিছুক্ষণ পর চলতে শুরু করল। বস্তুটিকে ঠেলা মাত্রই বস্তুটিতে গতি সৃষ্টি হয় না কেন? বস্তুটি কখন সচল হবে? iv) সাধারণত বাড়ির জল সরবরাহের ট্যাঙ্ক বাড়ির সবচেয়ে উঁচুস্থানে রাখা হয় কেন? v) মাছ সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ বরফ না নিয়ে নুন-মেশানো বরফ নেওয়া হয় কেন? vi) বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কারণ দুটি লেখো। vii) পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা 0^oC বা তার কম হলে বিশুদ্ধ বরফ গলতে পারে না কেন? [ধরে নেওয়া যাক অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত আছে।] viii) হিরের উচ্চ তাপ পরিবাহিতার একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো। ix) কার্বন ডাইঅক্সাইডের জারণধর্মের সমীকরণসহ উদাহরণ দাও। x) শুকনো খাবার সোডা ও অক্সালিক অ্যাসিডের গুঁড়ো মেশালে কোনো বিক্রিয়া ঘটে না; কিন্তু এই মিশ্রণে জল দিলে দ্রুত বিক্রিয়া ঘটে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বুদ্‌বুদ্ বেরোয়। এর কারণ কী হতে পারে? xi) জলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রাব্যতার উপর (a) উষ্ণতা ও (b) চাপের প্রভাব উল্লেখ করো। xii) উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস পাঠালে যে বিক্রিয়া ঘটবে তার সমীকরণ লেখো। xiii) আদা, রসুন আর পেঁয়াজ ব্যবহার করা হয় তোমার জানা এমন দুটো রান্নার নাম লেখো। xiv) মেজর কার্প ও মাইনর কার্পের দুটো পার্থক্য উল্লেখ করো। xv) উত্তরবঙ্গে মানুষ-হাতি সংঘাতের কারণ কী? xvi) মাটি থেকে হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কী কী প্রাকৃতিক উপায়ে ফিরিয়ে আনা যায়? xvii) বর্জ্য পরিষ্কারে ব্যাকটেরিয়া কীভাবে সাহায্য করে? xviii) লোহিত রক্তকণিকার আকার গোল ও দু-পাশ চ্যাপ্টা চাকতির মতো হওয়ার কারণ কী? xix) কোন কোন সমস্যায় আমলকী কাজে লাগে ?

7. ৩-৪টি বাক্যে উত্তর দাও: (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 3 নম্বর)

i) জলের ভেতর বুদবুদ চকচকে দেখায় কেন? ii) তোমার কাছে গরম খাবার অনেকক্ষণ ধরে গরম রাখার পাত্র (যেমন ফ্লাস্ক) নেই। অথচ কোন গরম খাবার তোমাকে অনেকক্ষণ গরম রাখতে হবে। তুমি কী কী করবে? কেন করবে? iii) প্লাস্টিকের স্ট্রকে সিল্কের কাপড় দিয়ে বেশ কয়েকবার ঘষলে। এবার ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোর সামনে ঐ নলটিকে নিয়ে গেলে। দেখা গেল নলটি কাগজের টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করছে। এর কারণ কী? iv) একটি স্টিলের চামচ বালতির জলে ফেললে সেটি ডুবে যায়। অথচ চামচের থেকে অনেক ভারী একটি স্টিলের গামলা জলে ভাসে কেন? v) অনেকসময় কাচের ফাটলে আলো পড়লে সেই স্থান বিভিন্ন অবস্থান থেকে চকচকে দেখায় কেন? vi) তরলের সমোচ্চশীলতা ধর্মের একটি বাস্তব প্রয়োগ ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করো। vii) পাশের ছবিটি দেখে তুমি যা বুঝতে পারলে তার ব্যাখ্যা দাও। viii) এমন দুটো সহজ পরীক্ষার উল্লেখ করো যার ফলাফল থেকে বোঝা যেতে পারে যে তরল আর গ্যাসীয় অবস্থায় অণুরা গতিশীল; ix) তোমাকে দুটো টেস্টটিউবের একটায় জিঙ্কের টুকরো আর অন্য একটায় ফেরাস সালফাইডের গুঁড়ো দেওয়া হলো। একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাপেক্ষে এদের শনাক্ত করবে কী করে? ভৌত পর্যবেক্ষণসহ লেখো। x) লোহার মরচে ধরা একটা অবাঞ্ছিত জারণ বিজারণের ঘটনা। কী কী উপায়ে লোহায় মরচে ধরায় বাধা দেওয়া যেতে পারে? xi) "$CuSO_4$ (দ্রবণ) + Fe → Cu + $FeSO_4$

(দ্রবণ) বিক্রিয়াটি ইলেকট্রনীয় বিচারে জারণ বিজারণ"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। xii) Al_2O_3 -এর সঙ্গে অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ার উপযুক্ত সমীকরণ দিয়ে বোঝাও কেন একে উভধর্মী অক্সাইড বলা হয়; xiii) কার্বন ডাইঅক্সাইড যে আম্লিক অক্সাইড তা প্রমাণ করতে একটা সহজ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করো। xiv) চুনজলে প্রথমে অল্প ও পরে অতিরিক্ত CO_2 গ্যাস পাঠালে কী ঘটবে সমীকরণ পর্যবেক্ষণসহ লেখো। xv) ঘাসজমির বাস্তুতন্ত্রে একশৃঙ্গ গন্ডারের ভূমিকা কী? xvi) তোমার অভিজ্ঞতা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের একটা ঘটনা সম্বন্ধে লেখো। xvii) খুব শুকনো ও গরম পরিবেশে ক্যাকটাস কীভাবে মানিয়ে নেয়? xviii) আমের জোড়কলম করা হয় কেন? xix) স্কুইড কীভাবে শিকার ধরে? xx) অ্যান্টার্কটিকার পরিবেশ দূষণের জন্য মানুষ কীভাবে দায়ী? xxi) ময়লা জলে মাছ চাষের সুবিধা কী? xxii) উট কীভাবে মরুভূমির জীবনে মানিয়ে নেয়? xxiii) খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি আর কৃষি— এই তিনটে ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া কীভাবে আমাদের উপকার করে? xxiv) ডায়ারিয়া হলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?

8. গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 3 নম্বর)

i) 2 বর্গ মি অঞ্চল জুড়ে 14 নিউটন বল কাজ করছে। চাপের মান কত? ii) একটি 50 গ্রাম ভরের পদার্থ খণ্ডের উষ্ণতা 2^0C বাড়াতে 25 ক্যালোরি তাপ লাগে। ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ কত? iii) 3200 ক্যালোরি তাপ দিয়ে 0^0C তাপমাত্রায় কত গ্রাম বরফকে ঐ একই তাপমাত্রায় জলে পরিণত করা যাবে? iv) এক ব্যক্তি 5 কিমি/ঘন্টা বেগে একটি আয়নার দিকে হেঁটে আসছে। তার প্রতিবিম্বের বেগ কত হবে? v) পরস্পর d দূরত্বে অবস্থিত দুটি বস্তুর ভর যথাক্রমে m_1 ও m_2। তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল F। — (a) প্রথম বস্তুর ভর দ্বিগুণ দ্বিতীয় বস্তুর ভর তিনগুণ করা হলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন ঘটবে? (b) ভর স্থির রেখে তাদের মধ্যে দূরত্ব চার গুণ করলেই বা ওই আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন হবে? vi) পৃথিবীর ভর চাঁদের ভরের প্রায় 100 গুণ। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ চাঁদের গড় ব্যাসার্ধের প্রায় চার গুণ। পৃথিবী ও চাঁদের পৃষ্ঠে একটি বস্তুর ওজনের তুলনা করো। [সমাধানের ইঙ্গিত: ধরা যাক, বস্তুটির ভর m, চাঁদের ভর M, চাঁদের ব্যাসার্ধ R, পৃথিবীপৃষ্ঠে ও চন্দ্রপৃষ্ঠে বস্তুটির ওজন যথাক্রমে W_e ও W_m]

$$\frac{W_m}{W_e} = \frac{G\frac{mM}{R^2}}{G\frac{m100M}{(4R)^2}} = \frac{16}{100} = \frac{1}{6} \text{ (প্রায়)]}$$

9. সূত্রের সাহায্যে শব্দছকটি পূরণ করো : (প্রতিটি শব্দের জন্য 1নম্বর)

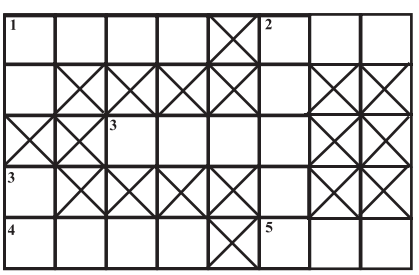

সূত্র

পাশাপাশি: 1. পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপশু
2. হিরে যা দিয়ে তৈরি
3. মরুভূমিতে বাস করা ছোটো ইঁদুরের মতো প্রাণী
4. মরুভূমিতে দেখার ভুল
5. কুয়াশা ও শিশির সৃষ্টি হয় জলীয় বাষ্প দ্বারা _____ বায়ু দিয়ে

ওপরনীচ : 1. সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ
2. সমুদ্র ফেনা
3. ফলের রাজা

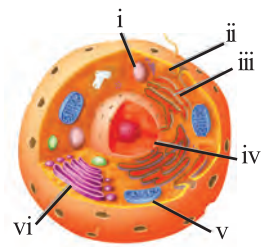

10. পাশে দেওয়া প্রাণীকোশের ছবিতে নিম্নলিখিত অঙ্গাণুগুলো দেখাও: (প্রতিটি অঙ্গাণুর জন্য 1 নম্বর)

লাইসোজোম, কোশ পর্দা, মাইটোকন্ড্রিয়ন, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, নিউক্লিয়াস, গলজি বডি

11. পাশে দেওয়া মৌমাছির জীবনচক্রের ছবিতে ফাঁকা বাক্সগুলো ভরাট করে তোমার খাতায় লেখো। (প্রতিটি শব্দের জন্য 1নম্বর)

শিখন পরামর্শ

নতুনভাবে নির্মিত বিদ্যালয় পাঠক্রমের দিক্‌নির্দেশ অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণির উপযুক্ত এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটির পঠন-পাঠন আর মূল্যায়নের জন্য এখানে কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলো।

তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণিতে শুরু হয়েছে শিশুর পরিবেশ চর্চা। নানারকম হাতেকলমে কাজ, অনুসন্ধান, আদান-প্রদান, কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে তার চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। আমরা চেয়েছি তারা দল বেঁধে কাজ করুক। আরও চাওয়া হয়েছে যে শিশুর জ্ঞানগঠনের এই প্রক্রিয়া যেন কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর না হয়। আশা করা হয়েছে এর ফলে শিক্ষার্থীর পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান, মূল্যবোধ আর দক্ষতার বিকাশ ঘটবে।

শিশুর পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার রূপায়ণে ষষ্ঠ, সপ্তম আর অষ্টম শ্রেণির 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'-এর নতুন বইগুলোতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন আর জীববিদ্যার অনুসন্ধানের সঙ্গেই সমন্বয় ঘটানো হয়েছে পরিবেশ চর্চার। বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে যাতে আলোচ্য প্রসঙ্গ বয়সোপযোগী হয়।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা 2005 আর শিক্ষা অধিকার আইন 2009 অনুযায়ী এই বইয়ের ভাষা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, ছবি ও বর্ণনা যথাসম্ভব শিশু-বান্ধব ও শিশুকেন্দ্রিক করার চেষ্টা হয়েছে।

আশা করা যায় শিক্ষার্থীর ইতিমধ্যে যতটুকু জ্ঞান, মূল্যবোধ আর দক্ষতা গঠন সম্পন্ন হয়েছে, তার ফলে সে এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। হয়ত এর ফলে শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় আপনাদের আরো বেশি করে নানারকম দলগত কাজের আয়োজন করতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ের চর্চায় পরীক্ষাগারের প্রয়োজন কতটা তা নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই। চেষ্টা করুন বিদ্যালয়ে সামান্য কিছু উপকরণ সংগ্রহ করার, যাতে আমাদের পড়ুয়ারা আরো বেশি করে হাতেকলমে কাজ করতে পারে। এই সব অনুসন্ধান যেন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। যেখানে প্রয়োজন, শিক্ষার্থী যেন নিজের খাতায়, হাতে-কলমে কাজ আর সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ লিখে রাখে। আনুষঙ্গিক বিষয়ে তার প্রশ্ন থাকলে, সেটাও লিখে রাখুক। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করুক। এসব কাজে উৎসাহ দিন। 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বিষয়ে নিজস্ব সংগ্রহ গড়ে তুলতে ওদের উৎসাহ দিন। সেগুলো সংরক্ষণের জন্য শ্রেণিকক্ষের একটা অংশ ব্যবহার করুন। দৈনন্দিন জীবনে জীবনকুশলতা চর্চার নানাদিক নিয়ে আলোচনা করুন। ছাত্রছাত্রীদের নানা সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করুন। শিক্ষার্থীরা এসব কাজে কীভাবে অংশগ্রহণ করছে, আপনি সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে আপনি প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রয়োজনে অষ্টম শ্রেণির এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটিতে আমরা কিছু প্রসঙ্গকে 'টুকরো কথা' বলে উল্লেখ করেছি। এগুলো গল্পের ছলে পড়বার জন্য, শিক্ষার্থী যেন মুখস্থ না করে। তাদের জানিয়ে দিন পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে এসব নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না।

শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের কাজ, প্রশ্ন করা, অন্যকে সাহায্য করা, বিদ্যালয় ও তার আশেপাশের পরিবেশকে প্রতিনিয়ত সুন্দর করে তোলার মধ্যে দিয়ে যে সবসময় প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন করা হচ্ছে তাও শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখুন।

আশা করা যায় আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অষ্টম শ্রেণির সব পড়ুয়ার কাছে 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

এই বই-এর পঠন-পাঠন সম্পর্কে আপনাদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও মূল্যবান পরামর্শের ভিত্তিতে আগামী দিনে বইটির উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে।